ইউনিট ৩

কৃষি কাজ

ভূমিকা

কৃষি কাজ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহন করে আসছে। আধুনিক যুগে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীলতা কমলে এখনও অনুন্নত দেশগুলোর বেশীর ভাগই কৃষির উপর বেশী নির্ভর। পৃথিবীর সবদেশেই কমবেশী কৃষি কাজ আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। কেননা কৃষি থেকে মানুষের খাদ্য, শিল্পের কাচামাল এবং অর্থকারী ফসল থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। কৃষিতে সবদেশেই বহু লোকের কর্ম সংস্থান হচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে কৃষি এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হচ্ছে এবং কৃষি এখন শিল্পে রূপ নিচ্ছে। এ ইউনিটে আমরা কৃষির বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, অনুকূল পরিবেশ, কৃষি পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকার কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বন্টন নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ- ১ কৃষির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও অনুকূল অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- কৃষির সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- কৃষির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- কৃষিকাজের বিকাশের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা (Definition)

মানুষের প্রাচীনতম অর্থনেতিক কার্যকলাপের মধ্যে কৃষি অন্যতম। সাধারনভাবে ভূমি চাষের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনকে কৃষি বলা হলেও প্রকৃত অর্থে কৃষির সংজ্ঞা আরও অনেক ব্যাপক। সময়ের বিবর্তনে কৃষিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে কৃষি বলতে ভূমি কর্ষণের মাধ্যমে ফসল আবাদের পাশাপাশি গবাদি পশু প্রতি পালন, হাঁস-মুরগী, মৎস্য ও মৌমাছি প্রতি পালন এবং চাষাবাদের উদ্দেশ্যে খামার প্রতিষ্ঠা, বন সৃজন ইত্যাদিকে কৃষি কাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর বহুদেশ আধুনিক যুগেও প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।

কৃষিকাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

কৃষি মানুষের প্রাচীনতম একটি পেশা। কৃষির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ঃ** কৃষি ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকাই প্রধান। কোন দেশের কৃষির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা প্রকৃতির উপরই বেশী নির্ভরশীল। মাটি, জলবায়ু এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈবিক প্রক্রিয়া এ তিনটি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর কৃষিকার্য মূলত নির্ভরশীল। তাই প্রকৃতির উপর নির্ভর শীলতা কৃষির একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

২. **স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঃ** কৃষির এটি আর একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ বীজের অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, প্রসার সবই স্বাভাবিক নিয়মে হয়। যার উপর মানুষের কোন হাত নেই।

৩. **প্রাচীন পোশা ঃ** কৃষি একটি প্রাচীনতম পেশা যা আজও সারা পৃথিবীতে বিদ্ধমান।

৪. **ব্যাপকতা ঃ** কৃষিকার্য কম বেশী সব দেশেই রয়েছে। এটি সারা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান।

৫. **মৌসুমী উৎপাদন ঃ** কৃষি মৌসুম নির্ভরশীল। বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন কৃষিকার্য হয়। তাই মৌসুমী নির্ভরতা কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্য।

৬. **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ঃ** কৃষির উৎপাদন সর্বদা সমান থাকে না। এটা প্রথমে অনুকূল পরিবেশে বেশী থাকে এবং ক্রমশ আস্তে আস্তে উৎপাদন কমতে থাকে।
৭. **স্বল্প উৎপাদন ঃ** অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা কৃষিতে কম উৎপাদন হয়।
৮. **উৎপাদনে বৈচিত্রতা ঃ** বিচিত্র উৎপাদন কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেখা যায় যে, একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে।
৯. **অনিশ্চিত উৎপাদন ঃ** কৃষির উৎপাদন সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির কারনে কোন বৎসর ভাল ফসল আবার কোন বৎসর কম ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। এটাও কৃষির একটি বৈশিষ্ট্য।
১০. **পণ্যের প্রকৃতি ঃ** কৃষিজাত পণ্য বেশীরভাগ ভারী ও পচনশীল বলে দ্রুত বাজারজাত করতে হয়।
১১. **ব্যাপক অঞ্চল ঃ** কৃষিযোগ্য জমি অনেক, যেখানে ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি দেশের কৃষিযোগ্য ভূমিতে চাষ হয়ে থাকে।
১২. **বিনিয়োগ ফেরতে কম গতি ঃ** কৃষিতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পেতে অনেক সময় লাগে। কারণ হলো প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।
১৩. **পুরাতন চাষ পদ্ধতি ঃ** কৃষিতে নিয়োজিত লোকজন কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বলে জমিতে আধুনিক পদ্ধতি কম ব্যবহার করে। যার ফলে গরীব দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ প্রসার ঘটেনি।

কৃষির গুরুত্ব (Importance)

কৃষি একটি অতি প্রাচীন পেশা। এটা মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন পূরন করতে সক্ষম। নিম্নে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো:

১. **খাদ্য সরবরাহের উৎস ঃ** মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য যেমন শস্য, ফলমূল, মাংশ, দুধ, শাক-সব্জি, ডাল প্রভৃতির উৎস হলো কৃষি। তাই খাদ্যের প্রধান উৎসই কৃষি।
২. **কর্ম সংস্থান ঃ** কৃষিতে প্রতিটি দেশেরই বিপুল পরিমান লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে নিয়োজিত। বিশেষ করে অনুন্নত দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কাজে নিয়োজিত।
৩. **জাতীয় আয় ঃ** সকল দেশেরই জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি থেকে আসে। আর অনুন্নত দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসই হলো কৃষি।
৪. **জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঃ** কৃষিতে উন্নয়নের ফলে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে মূলধন গঠন হয় ও শিল্প গড়ে উঠে। ফলে মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।
৫. **শিল্পের কাচামালের উৎস ঃ** বহু শিল্পের কাচামাল কৃষি থেকে পাওয়া যায়। কৃষি প্রাথমিক শিল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের কৃষি নির্ভর শিল্প কৃষির উপর নির্ভরশীল। যেমন- চা, চিনি, চামড়া, বস্ত্র, পাট, পশম, রেশম, দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি শিল্প কৃষির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে।
৬. **বৈদেশিক মুদ্রার উৎস ঃ** বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কৃষি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন দেশ, পাট, তুলা, চা, চামড়া, মৎস্য ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
৭. **সামগ্রিক শিল্প উন্নয়ন ঃ** কৃষি পণ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠে, যার ফলে দেশে সামগ্রিকভাবে শিল্প গড়ে উঠে। যেমন, পাট উৎপাদন অঞ্চলে পাট শিল্প, তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলে তুলা শিল্প, রেশম উৎপাদনকারী অঞ্চলে রেশম শিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠে।
৮. **রাজস্বের উৎস ঃ** কৃষি পণ্যের উপর কর ধার্য করে সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে। ফলে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বেশী হলে রাজস্ব বেশী আয় হয়, আবার কৃষি পণ্যের উৎপাদন কম হলে রাজস্ব আদায় কম হয়।
৯. **কৃষির প্রয়োজনে শিল্প ঃ** কৃষির জন্য কৃষিযন্ত্র, কীটনাশক, সার প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। ফলে এ ধরনের শিল্প কৃষি প্রধান অঞ্চলে গড়ে উঠে।
১০. **বাণিজ্যের প্রসার ঃ** কৃষিজাত পণ্যের বিশ্ববাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত রপ্তানি করে এবং যাদের প্রয়োজন তারা আমদানী করে। ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।
১১. **খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন শিল্পের প্রসার ঃ** বিভিন্ন কৃষিপণ্য খাদ্য উপযোগী ও রক্ষনের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ গম থেকে আটা, রুটি, বিস্কুট, তেল বীজ থেকে ভোজ্য তেল, আখ ও বীট থেকে চিনি, ফল থেকে ফলের রস প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে।

কৃষিকাজের অনুকূল অবস্থাসমূহ (Favourable Elements)

কৃষিকাজের প্রসারের পেছনে বিবিধ উপাদান কাজ করে। তার মধ্যে প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক উপাদান প্রধান। নিম্নে কৃষিকাজের বিকাশের পেছনে অনুকূল কারণগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

কৃষি কাজের প্রসারে প্রাকৃতিক উপাদনই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তার মধ্যে জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, ভূমির বন্ধুরতা, সেচের পানির উৎস প্রভৃতি প্রধান। নিম্নে প্রাকৃতিক উপাদানগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

জলবায়ু ঃ ফসল উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে জলবায়ুর প্রভাব অত্যধিক। এ ক্ষেত্রে মানব সভ্যতা ও প্রযুক্তি তেমন কোন কাজে আসেনা। জলবায়ুর মধ্যে সূর্য কিরণ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ প্রভৃতির উপর বীজের অঙ্কুরোদগম, ফসলের বৃদ্ধি ফলন প্রভৃতি নির্ভরশীল। জলবায়ুর তারতম্যের কারণে ফসলেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন, আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলে ধান, পাট, মধ্যম আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গম, তুলা প্রভৃতির ভাল ফলন হয়।

২। ভূমিরূপ ঃ ভূমির রূপ বলতে ভূমির বন্ধুরতা, ভূমির ঢাল, সমুদ্র সমতল থেকে এর উচ্চতা প্রভৃতি কৃষি কাজকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে। পর্বত ও মালভূমি অপেক্ষা নিম্ন সমতল ভূমিতে চাষাবাদ করা সহজ। আবার পর্বতের ঢাল কেটে চাষ করা কষ্টকর ও ব্যয় বহুল। পাহাড়ি অঞ্চলে ফসল দেরীতে ফলে। আবার ভূ-প্রাকৃতিক কারণে যে সকল স্থানে জলাবদ্ধতা হয় সেখানে চাষাবাদ ব্যাহত হয়।

৩। মাটির ধরন ঃ মৃত্তিকার গঠন, উর্বরতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যর জন্য কৃষির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। নদীবাহিত পলি মাটিযুক্ত ভূমিতে ধান-পাট ভাল জন্মে। দোয়াশ মাটিতে তুলা, সরিষা ফসল ভাল জন্মে। আবার বেলে মাটিতে প্রচুর বাদাম ফলে।

৪। পানির উৎস ঃ পানি কৃষির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সকল স্থানে পানির অভাব থাকে সেখানে কৃষিকার্য ভাল হয়না। যেমন, মরুভূমিতে পানির অভাবে ফসল ফলে না। তাই নদী, হ্রদ, উন্মুক্ত জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ জলাধার থেকে পানি উত্তোলন করে সেচেরে ব্যবস্থা করা হয়। পানির সমস্যা থাকলে ফসল উৎপাদনে সমস্যা হয়।

৫। কীট পতঙ্গ ও পাখি ঃ মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ পরাগায়নের ম্যাধমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আবার কেঁচো প্রাকৃতিক লাঙ্গল হিসেবে কাজ করে যা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার অনেক ধরনের পাখি ফসলের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাই এ সকল কীটপতঙ্গ ও পাখি কৃষি কাজের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ

প্রাকৃতিক উপাদানের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উপাদানও কৃষি কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যে সকল আর্থ-সামাজিক উপাদান কৃষি কাজের অনুকূল উপাদান হিসেবে কাজ করে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. **ঘনবসতি ঃ** যে সকল স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী সে সকল অঞ্চলে অনাবাদী জমি দেখা যায় না। সব জমিই কৃষিকাজের আওতায় আসে। পক্ষান্তরে জনবসতি কম হলে অনেক আবাদযোগ্য কৃষি জমি অনাবাদী থেকে যায়। ফলে কৃষিকাজের প্রসার জন ঘনত্ব কম অঞ্চলে কম হয়।

২. **শ্রমের যোগান ঃ** কৃষি কাজে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় বেশী। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ বাদে বিশ্বের বেশীরভাগ দেশেই কৃষি সস্তা শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল।

৩. **ভূমির মালিকানা ঃ** ভূমির মালিক নিজে কৃষি কার্য পরিচালনা করলে কৃষিতে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। আবার খন্ড খন্ড জমি একত্রে চাষ করতে পারলে চাষাবাদ সহজ হয়।

৪. **কৃষি উপকরনের যোগান ঃ** সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতির যোগান স্বাভাবিক হলে কৃষির প্রসার ঘটে। আবার কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারলে কৃষিকাজ সহজ হয় ও কৃষি বৃদ্ধি পায়।

৫. **সেচ সুবিধা ঃ** কৃষির জন্য সেচের প্রয়োজন হয়। সেচ সুবিধা কৃষি কাজকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে শুষ্ক অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে গ্রীষ্ম কালে কৃষি কাজ ব্যাহত হয়।

৬. **বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ** বন্যা কবলিত এলাকায় কৃষিকার্য বাধা গ্রস্ত হয়। বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। তাই বন্যা কবলিত এলাকায় বন্যা প্রতিরোধ করে কৃষির উন্নয়ন করা যায়।

৭. **অর্থের সংস্থান ঃ** কৃষি কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যেমন, শ্রমের মজুরী, সার, সেচ যন্ত্রপাতি, কীটনাশক, ঔষধ প্রভৃতি কাজে অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থের যোগন পর্যাপ্ত না হলে কৃষিকার্য ব্যাহত হয়।

৮. **সংরক্ষন ব্যবস্থা ঃ** বিশেষ করে পচনশীল পণ্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদনে উৎসাহ বোধ করে না। সংরক্ষনের ব্যবস্থার অভাবে ফসল নষ্ট হয়। ফলে উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হয়। তাই সংরক্ষন ব্যবস্থা কৃষি কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৯. **পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা কৃষি কার্য সম্প্রসারণ সহায়ক। পরিবহন ব্যবস্থা না থাকলে পণ্য বাজারজাত করতে পারে না ফলে কৃষকরা কৃষি কাজে উৎসাহিত হয় না এবং এতে লাভবান হতে পারে না।

১০. **বাজারজাতকরণ ঃ** উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করার সুব্যবস্থা কৃষি কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যদি দ্রুত পণ্য সামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে রপ্তানি করা যায় তবে তা কৃষিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১১. **কৃষি বিষয়ক গবেষণা ঃ** উন্নত কৃষি বীজ এবং লাগসই প্রযুক্তি কৃষি উন্নয়নে সহায়ক। তাই যদি এ বিষয়ে গবেষনা করে উন্নত বীজ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয় তবে কৃষির প্রসার ঘটে। যেমন, বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল ধানের উদ্ভাবনের ফলে দেশে ধান উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২. **রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ঃ** রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা কৃষি উন্নয়নের জন্য একান্ত অপরিহার্য। রাষ্ট্র যদি কৃষি উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে তবে কৃষিতে উন্নয়ন তরান্বিত হয়। যেমন, সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ধান বীজ প্রদান, উপযুক্ত বিক্রয়মূল্য নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

পাঠ-সংক্ষেপ

- কৃষি একটি প্রাচীনতম পেশা। কৃষি বলতে জমি কর্ষনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে গবাদি পশু প্রতিপালন, হাস-মুরগী, মৎস্য ও মৌমাছি প্রতিপালন এবং চাষবাসের উদ্দেশ্যে খামার প্রতিষ্ঠা করা, বন সৃজন ইত্যাদিও কৃষিকাজের আওতাভূক্ত।
- কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রকৃতির উপর নির্ভর শীলতা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, প্রাচীনতম পেশা, ব্যাপকতা, মৌসুমী উৎপাদন, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন, স্বল্প উৎপাদন, উৎপাদনে বৈচিত্রতা, অনিশ্চিত উৎপাদন, কৃষিপণ্য পচনশীল ও ভারী, ব্যাপক অঞ্চল, বিনিয়োগ ফেরতে কমগতি, পুরন চাষ পদ্ধতি প্রভৃতি।
- কৃষির গুরুত্বের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ, কর্ম সংস্থান, জাতীয় আয়, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, কাঁচামালের উৎস, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সামাগ্রিক শিল্প উন্নয়ন, রাজস্বের উৎস, কৃষি শিল্পের উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রসার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ, শিল্পের প্রসার প্রভৃতি।
- কৃষির উন্নয়নে প্রাকৃতিক উপাদানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মধ্যে জলবায়ু, ভূমিরূপ, মৃত্তিকার ধরন, পানির উৎস, কীট পতঙ্গ , পাখি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- প্রাকৃতিক উপাদানের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহও গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- জনবসতির ঘনত্ব, শ্রমের যোগান, ভূমির মালিকানা, কৃষি উপকরনের যোগান, সেচ সুবিধা, বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা, অর্থের সংস্থান, সংরক্ষন ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা, বাজার জাতকরণ সুবিধা, কৃষি বিষয়ক গবেষণা, রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রভৃতি যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। নিচের কোনটি কৃষিকাজের আওতা ভূক্ত নয়?

ক. হাঁস মুরগী পালন খ. মৌমাছি পালন

গ. বনসৃজন ঘ. খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ

২। নিম্নের কোন্‌টি কৃষির বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. ব্যাপকতা খ. মৌসুমী উৎপাদন
গ. স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘ. জলাবদ্ধতা

৩। নিম্নের কোন্‌টি কৃষির গুরুত্বের মধ্যে পড়ে না?
ক. খাদ্যের উৎস খ. রাজস্ব আয়
গ. শিক্ষার উন্নয়ন ঘ. বাণিজ্যের প্রসার

৪। নিম্নের কোন্‌টি কৃষি কাজের উন্নয়নে প্রাকৃতিক উপাদান নয়?
ক. জলবায়ু খ. ঘনবসতি
গ. মাটির ধরন ঘ. পানির উৎস

পাঠ- ২ বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিশ্বের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগের নাম বলতে পারবেন
- বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রগাড় কৃষি ব্যবস্থা ও ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ পদ্ধতি, উন্নত দ্রব্য, চাষের মাত্রাগত তীব্রতা প্রভৃতির কারণে বিশ্বের আবাদী জমিতে বিভিন্ন ধরনের চাষ ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটেছে। বিশ্বের প্রচলিত চাষ ব্যবস্থাকে প্রধান পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা- ক) প্রতিবেশগত কৃষি ব্যবস্থা; খ) স্বয়ং ভোগী কৃষি ব্যবস্থা; গ) বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা; ঘ) যৌথ কৃষি ব্যবস্থা; ঙ) অর্থকরী ফসল চাষ ব্যবস্থা। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর চাষ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) প্রতিবেশগত চাষ ব্যবস্থা

১। যাযাবর পশু পালন ঃ এটি পৃথিবীর আদিম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলোর মধ্যে অন্যতম। আফ্রো-এশিয়ার শুষ্কতম মরুভূমি এলাকায় প্রায় ১৩,০০০ বছর ধরে যাযাবার পশু-পালন বৃত্তি চলে আসছে। সাহারা ইরান, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থানের শুষ্কতম এলাকায় কাটা-ঝোপ জাতীয় ছোট ছোট গাছ জন্মে। যাযাবর শ্রেণীর লোক পশু-পালন করে জীবিকা অর্জন করে। এ এলাকায় অন্য কোন ফসল ফলে না। ছাগল, উট, ভেড়া, মেষ প্রভৃতি জাতীয় পশু দলবদ্ধভাবে চারণ করে। একস্থানের ঘাস ও পানি শেষ হলে অন্য স্থানে চলে যায়। যাবতীয় প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, পরিধেয়, আশ্রয় ও অন্যান্য উপকরনের জন্য তারা পশু পালনের উপরই নির্ভরশীল। প্রসিদ্ধ যাযাবরদের মধ্যে মোঙ্গাস, হুন প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ইরান, চীন, সৌদী আরব প্রভৃতি দেশে যাযাবরদের জন্য স্থায়ী আবাস ও অন্যান্য সুবিধা দিচ্ছে। এ ভাবে তাদের জীবন যাত্রার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

২। স্থানান্তরিত কৃষি ঃ নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় আর্দ্র মন্ডলের বনের গাছ কেটে মানুষ চাষাবাদ করে থাকে। এভাবে পরিস্কৃত একটি এলাকা মাত্র দুই থেকে তিন বৎসর চাষের উপযোগী থাকে। তখন তারা আবার অন্যত্র গিয়ে বনের গাছ পালা কেটে পরিস্কার করে নতুন করে চাষাবাদ করে। এ চাষ পদ্ধতিকে স্থানান্তরিত বা ভ্রাম্যমান চাষ পদ্ধতি বলে। আবাদ স্থান পরিবর্তনের পাশাপাশি আবাসস্থলও পরিবর্তিত হয়। নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় এশিয়ার বনাঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা এবং দক্ষিন ও মধ্য আমেরিকার অববাহিকায় এ চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এ চাষ পদ্ধতিতে প্রথমে একটি এলাকা নির্বাচন করে সেখানকার গাছপালা কেটে একত্রে জমা করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে। পরিস্কৃত জায়গায় বিভিন্ন স্থানে গর্ত করে প্রতিটি গর্তে ছাই দিয়ে মাটি মিশিয়ে রাখে। তারপর প্রতিটি গর্তে বিভিন্ন বীজ পুতে রাখে। বর্ষার আগে একাজগুলো করে রাখে। বর্ষার আগমনের সাথে সাথে চারা জন্মে এবং ফসল উপযুক্ত হলে সংগৃহ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফসল ফলে থাকে। যেমন, এশিয়ার ধান, দক্ষিন ও মধ্য আমেরিকার ভূট্টা, আফ্রিকায় যোয়ার, বজরা প্রভৃতি চাষ হয়। এখানে খাদ্য শষ্যের পাশাপশি সব্জিরও চাষ হয়।

খ) স্বয়ং ভোগী কৃষি ব্যবস্থা

শুধুমাত্র মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে যে ব্যববস্থা করে থাকে তাকেই স্বয়ং ভোগী চাষ ব্যবস্থা বলে। নিম্নে স্বয়ং ভোগী চাষ ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করা হলোঃ

৩। আদিম স্থিতিশীল ভূমি কর্ষণ

এ পদ্ধতিতে আবাদী জমিতে আদিম যন্ত্রের মাধ্যমে নিকট দূরত্বে আইল তৈরী করা হয়। দুই আইলের মধ্যে জমিতে ফসলের বীজ বপন করা হয়। এভাবে একইভাবে বিরতিসহ একাধিক ফসল উৎপাদন করা হয়। প্রয়োজনে সেচ ব্যবহার করে। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে ভূট্টা, জোয়ার, গোল আলু, মিষ্টি আলু, কলা, কাসাভা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কোথাও কোথাও কফি, কোকো, নারিকেল, রাবার প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। এ চাষ ব্যবস্থার মধ্য আফ্রিকার মাদাগাসকার, উগান্ডা, নাইজার, মালি, ল্যাটিনআমেরিকার মেক্সিকো, ইকুয়েডর, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ উল্লেখরযাগ্য।

৪। ধান প্রধান নিবিড় কৃষি ব্যবস্থা

আর্দ্র মৌসুমী ভাবাপন্ন ঘনবসতিপূর্ণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, ময়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়া প্রভৃতি দেশে নিবিড় কৃষি ব্যবস্থা চালু আছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্ষুদ্রায়তন জমি ঃ ঘনবসতি ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত। দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে।

নিবিড় চাষাবাদ ঃ আবাদি জমিতে বছরে দুই থেকে তিনটি ফসল ফলান হয়। হেক্টর প্রতি উৎপাদনও বেশী হয়ে থাকে।

ধানের প্রাধান্য ঃ এ পদ্ধতিতে ধানের প্রাধান্য বেশী এবং উৎপন্ন ফসলের ৮০ থেকে ৯০ ভাগ খাদ্য শস্য। ধানের পাশাপাশি গম, তেলবীজ, কার্পাস তুলা, গোল আলু, পাট, সীম জাতীয় ফসল এবং সব্জী চাষ হয়।

কায়িক শ্রম নির্ভর ঃ এখানে পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত বলে কৃষি কাজের বেশীর ভাগই কায়িক শ্রম নির্ভর।

একাদিক্রমে চাষাবাদ ঃ আবাদী জমি বহু বছর ধরে চাষাবাদের আওতায় রয়েছে। আবাদযোগ্য জমি সাধারনত: পতিত থাকে না।

চাষাবাদ প্রকৃতির উপর বেশী নির্ভরশীল ঃ সেচ ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে চাষাবাদ হয় বেশী। অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি ফসলের ক্ষতি সাধন করে। তবে আস্তে আস্তে বৃষ্টি নির্ভরতা কমতে শুরু করেছে।

৫। ধান বিহীন নিবিড় কৃষি ব্যবস্থা ঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলের যে সকল স্থানে ধান চাষের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হয় এবং জনবসতি ঘন সেসকল স্থানে নিবিড় কৃষির আওতায় অন্যান্য ফসল ফলানো হয়। এটির বৈশিষ্ট্য প্রায় নিবিড় ধান চাষের অনুরূপ। কেবল উৎপাদিত পন্য ভিন্নতর। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে গম, তুলা, ইক্ষু, ভূট্টা, তেলবীজ, ছোলা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য ফসল। ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চল, পাকিস্তান, চীনের উত্তর পূর্বাংশ এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থার আওতায় পড়ে।

৬। স্বয়ং ভোগী পশুপালন ও শস্য চাষ

পৃথিবীর কোন কোন স্থানে নিজস্ব চাহিদা পূরনে একই অঞ্চলে সনাতন পদ্ধতিতে শস্য চাষের পাশাপাশি গবাদী পশুও পালন করে থাকে। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে গম, ভূট্টা, জোয়ার, বজরা, আলু প্রবৃতি। গবাদি পশু মূলত দুধ, পশম এবং মাংশের জন্য প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের কৃষি কার্য মেক্সিকো, তুরস্ক, ইরাক এবং ইরানের অংশ বিশেষে পরিলক্ষিত হয়।

৭। ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি ব্যবস্থা ঃ ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো মৃদুভাবাপন্ন আর্দ্র বর্ষন যুক্ত শীত কাল, শুষ্ক গ্রীষ্ম কালীন পরিবেশ ও পার্বত্য, বন্ধুর প্রভৃতি। শীত কালের বৃষ্টির উপর নির্ভর করে সমতল ভূমিতে গম, ভূট্টা, যব ও সব্জি চাষ হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে তুলা, তামাক, বীজ ও বিভিন্ন সব্জি চাষ হয়। পার্বত্য ও ঢালু অঞ্চলে জলপাই এবং আঙ্গুর বাগান গড়ে উঠেছে। এছাড়া এ অঞ্চলে প্রচুর কমলা লেবুর চাষ হয়। এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থার আওতাধীন অঞ্চল হলো উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ।

গ) বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা

মানুষ নিজস্ব চাহিদাপূরণ করার পর উদ্বৃত্ত ফসল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য এ ধরনের কৃষিকার্য করে থাকে। নিম্নে বাণিজ্যিক ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার বর্ণনা দেয়া হলো:

৮। বণিজ্যিক পশুচারন খামার ঃ উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্থায়ী পশুচারন খামার গড়ে উঠেছে। প্রতিটি খামার আকারে অনেক বড়। খামারের আশে পাশের ঘাস গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য। তবে মানুষের তৈরী সুষম খাবারও ব্যবহৃত হয়। খামারের চারি দিকে সেচের ব্যবস্থা আছে।

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যেই মূলত: গবাদী পশু প্রতি পালন করা হয়। এর মধ্যে উন্নত প্রজাতির গরু, ভেড়া, ছাগল এবং ঘোড়াই বেশী। পশুর মাংশ, চামড়া, লোম প্রভৃতি রপ্তানি করে থাকে।

৯। বাণিজ্যিক শস্য চাষ বা ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা

উত্তর আমেরিকার প্রেইরী, ইউরেশিয়ার স্তেপ, আর্জেটিনার পাম্পা, দক্ষিন আফ্রিকার ভেল্ড প্রভৃতি তৃণ ভূমিতে ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চল হালকা জনবসতি পূর্ণ এবং এখানে যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ করা হয়। এ কৃষি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

বিশালায়তন ঃ এ অঞ্চলের জনবসতি হালকা বলে আবাদী জমিগুলো অনেক বড় এবং একই সমতলে অবস্থিত।

ব্যাপক অঞ্চলে চাষাবাদ ঃ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বছরে মাত্র একটি ফসল ফলান হয়। তাই হেক্টর প্রতি ফলন অপেক্ষাকৃত কম।

গমের প্রাধান্য ঃ এ অঞ্চলে বেশীর ভাগই গম উৎপন্ন হয়। তবে যব, ভূট্টা ও সব্জিও কিছু চাষ হয়।

যান্ত্রিক উপায়ে চাষ ঃ জমি তৈরী থেকে শুরু করে বীজ বপন, ফসল কাটা প্রভৃতি সবকাজই যন্ত্রের সাহায্যে করে থাকে।

জমি পতিত রাখা ঃ এ অঞ্চলে পরিকল্পিত ভাবে এক বা একাধিক বছর জমি অনাবাদী রাখা হয়।

চাষাবাদ বাজারের চাহিদার উপর র্নিভরশীল ঃ বাজারে চাহিদা কম থাকলে ফসল অবিক্রিত থাকে। তাই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করে থাকে। তাই জমি পতিত রেখে শস্য উৎপাদন সীমিত রাখে।

১০। বাণিজ্যিক পশুপালন ও শস্য চাষ বা মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা

উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য অংশে আর্দ্র অঞ্চলের একই জমিতে বাণিজ্যিক ফসল আবাদের পাশাপাশি পশু পালন করা হয়। এটাকেই মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থায় মানুষ ও পশুর খাদ্য উপযোগী শস্য উৎপাদন করা হয়। গম মানুষের খাদ্য হিসেবে, জুঁই পশুর খাদ্য হিসেবে এবং ভূট্টা মানুষ এবং পশু উভয়ের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আলু শালগম বীট প্রভৃতি। মিশ্র কৃষি ব্যবস্থায় গরু, শুকর, হাস-মুরগী পালন করে। ভারবাহী, পশুর মধ্যে ঘোড়া, ষাড় প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে দুগ্ধ খামার সব্জি বাগান, ফল ও ফুলের বাগান প্রাধান্য পাচ্ছে। এগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থা 'ট্রাক ফার্মিং' নামেও পরিচিত।

১১। বাণিজ্যিক গব্য বা ডেইরী ফার্মিং ঃ ইউরোপের ডেন মার্ক, হল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, নরওয়ে, সুইডেন, পোল্যান্ড, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পূর্বাংশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গব্য খামার বিকাশ লাভ করেছে।

এখামারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের গবাদী পশু প্রতিপালন করলেও উন্নত প্রজাতির গাভী বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। টাটকা দুধ, টিনজাত দুধ, গুড়াদুধ, মালাই, মাখন, পনির, ঘি প্রভৃতি উৎপাদন করে থাকে।

খামারে উন্নত জাতের ঘাসের চাষ করে। আবার কৃত্রিম পদ্ধতিতে গোখাদ্য তৈরী করে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও গব্য খামার প্রসার লাভ করেছে।

১২। বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উদ্যান কৃষি ব্যবস্থা

অর্থনৈতিকভাবে উন্নত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বিশেষ যত্ন সহকারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সব্জি, ফল ও ফুলের বাগান গড়ে উঠেছে। এগুলো বড় বড় শহর কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সব্জি, ফল ও ফুল টাটকা রাখার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহন ব্যবহার করা হয়।

এ কৃষি ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। বীজ নির্বাচন, কিটনাশক প্রয়োগ, নার্সারী তৈরী এবং গ্রীন হাউস তৈরী এর অন্তর্ভূক্ত।

ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ও বেলজিয়ামের আঙ্গুর বাগান, নেদারল্যান্ডের ফুলের বাগান, যুক্ত রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় সালাদ ও অন্যান্য সব্জি বাগান এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থার উদাহরণ।

১৩। শিল্প ফসল আবাদ ঃ বিশ্বের কিছু কিছু অঞ্চলের শিল্পের কাচামাল উৎপাদনে বানিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ হয়। তার মধ্যে কার্পাশ তুলা, পাট, ইক্ষু, তামাক ইত্যাদি অন্যতম শিল্প ফসল। কয়েকটি দেশে শিল্প ফসলের আবাদী এলাকা রয়েছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল, মিশরের নীলনদের উপত্যকা, ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অঞ্চল এবং চীনের হোয়াংহো অববাহিকায় তুলার চাষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ভারত ও বাংলাদেশের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা পাট চাষে প্রসিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া ও কেনটাকি অঞ্চল, ভারতের তামিলনাড়ু, কিউবার হাবানা প্রভৃতি অঞ্চল তামাক চাষের জন্য খ্যাত। আবার ভারতের উজান গঙ্গা এবং ব্রাজিলের বাহিয়া অঞ্চল আখ চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

খ) যৌথ কৃষি ব্যবস্থা

বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে রাষ্ট্র ও কৃষকদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় কৃষিকার্য পরিচালনা হয়। যৌথ খামার এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৪। যৌথ খামার ঃ সামাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে চীন, উত্তর কোরিয়া ও অন্য কয়েকটি দেশে যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। রাশিয়া ভেঙ্গে যাবার পর যৌথ কৃষি ব্যবস্থা অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে।

এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থায় মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যক কৃষকদের নিকট এ খামারগুলো ইজারা দেয়া হয়। এর বিনিময়ে সরকার রাজস্ব আদায় করে থাকে, যা ফসলের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয়। ফলে সঠিক উৎপাদনে বেশী উৎসাহিত হয়। সার, বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরকার সরবরাহ করে থাকে। কৃষকরা শ্রম দিয়ে থাকে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাইরেও এ ধরনের খামার ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। তবে তা স্বেচ্ছায় হয়ে তাকে।

ঙ) অর্থকরী ফসল চাষ ব্যবস্থা

ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিশেষ কিছু এলাকা দীর্ঘ দিন যাবৎ শুধুমাত্র একটি ফসেলর অধীন রাখা হয়। রপ্তানির উদ্দেশ্যে এখানে ফসল উৎপাদন করে। বাণিজ্যিক উপনিবিষ্ট কৃষি এ কৃষিব্যবস্থার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

১৫। বাণিজ্যিক উপনিবিষ্ট কৃষি ব্যবস্থা

এ কৃষির আওতায় চা, কফি, রাবার, তেল, গাম প্রভৃতি গাছের বাগান এ কৃষি ব্যবস্থার অন্তরগত। প্রতিটি বাগানের স্থায়িত্ব ৪০ বছর বা তার বেশীও হয়ে থাকে। বাগান এলাকাতেই শ্রমিকদের স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তোলা হয়। ভারতের আসাম, বাংলাদেশের সিলেটের চা বাগান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাবার ও তেল-গাম গাছের বাগান, দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলের কফি বাগান এ ধরনের কৃষি ব্যবস্থার আওতাভূক্ত। এ ধনের বাগান থেকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ফসল সংগ্রহ করা হয়। কিছু প্রক্রিয়াজাত করার পর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা হয়।

প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থা ও ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে প্রগাঢ় ও ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা অন্যতম। এ দু'ধরনের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ দুধরনের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখান হলোঃ

নিবিড় কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক	ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক
১. এ কৃষি ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নিজস্ব বা স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা।	১. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এ কৃষি কাজ করা হয়।
২. দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার আর্দ্র ভাবাপন্ন নিম্ন সমভূমি অঞ্চলে এ কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।	২. উত্তর আমেরিকার পেইরী এবং ইউরেশিয়ার স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল এ কৃষি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।
৩. এ কৃষি ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে চালু রয়েছে।	৩. পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত হালকা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ কৃষি ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়।
৪. এ কৃষি ব্যবস্থার অধীন জমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত।	৪. এ কৃষি ব্যবস্থাধীন আবাদী জমির আকার অনেক বিশাল আকৃতির।
৫. এ কৃষি জমিতে বছরে ২/৩ বার ফসল উৎপাদন করা হয়।	৫. এ কৃষি ব্যবস্থাধীন জমিতে বছরে মাত্র একবার ফসল উৎপাদন করা হয়। আবার কখনও কখনও জমি পতিত রাখা হয়।
৬. এ কৃষি ব্যবস্থায় আদিম পদ্ধতিতে চাষকার্য করা হয়।	৬. এ কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

নিবিড় কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক	ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক
	পরিচালিত হয়।
৭. এ কৃষির প্রধান ফসল ধান। তবে গম, ডাল, তেলবীজ, সব্জি প্রভৃতিও আবাদ হয়।	৭. এ কৃষি ব্যবস্থায় প্রধানত গম উৎপন্ন হয়।
৮. হেক্টর প্রতি ফলন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী।	৮. হেক্টর প্রতি ফসল উৎপাদন মুলনামূলকভাবে অনেক কম।
৯. উৎপন্ন ফসল অধিকাংশই নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে যায় ফলে সংরক্ষনের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।	৯. ফসলের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন হয় বলে ব্যাপক সংরক্ষন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।
১০. বৃষ্টি ও এর প্রবাহে মৃত্তিকা উপরি স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত এবং অপসারিত হয়ে থাকে।	১০. এ কৃষি ব্যবস্থাধীন জমির ক্ষয় বায়ু জনিত কারণে হয় যেজন্য যথাযথ ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থাকে প্রধানত: পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ

ক) প্রতিবেশগত কৃষি ব্যবস্থা, যা আরো ২টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-
   ১। যাযাবর পশু পালন
   ২। স্থানান্তরিত কৃষি ব্যবস্থা

খ) স্বয়ংভোগী কৃষি ব্যবস্থা, যা আরো ৫টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:
   ১। আদিম স্থিতিশীল ভূমিকর্ষন
   ২। ধান প্রধান নিবিড় স্বয়ং ভোগী ভূমিকর্ষন
   ৩। ধান বিহীন নিবিড় স্বয়ং ভোগী ভূমিকর্ষন
   ৪। স্বয়ং ভোগী পশুপালন ও শস্যচাষ
   ৫। ভূমধ্য সাগরীয় কৃষি

গ) বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা, যা আরো ৬টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:
   ১। বাণিজ্যিক পশুচারণ
   ২। বাণিজ্যিক শস্য চারণ
   ৩। বাণিজ্যিক পশুপালন ও শস্যচাষ
   ৪। বাণিজ্যিক গব্য খামার
   ৫। বৈশিষ্ট্য মন্ডিত উদ্যান কৃষি
   ৬। শিল্পের জন্য ফসল আবাদ

ঘ) যৌথ কৃষি ব্যবস্থা, এর আলোকে যৌথ খামার গড়ে উঠেছে।

ঙ) অর্থকরী চাষ ব্যবস্থা, এর আলোকে বাণিজ্যিক উপনিবিষ্ট কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। যাযাবর পশু পালন কত বছর ধরে চলে আসছে?

ক. ১০,০০০ বছর খ. ১১,০০০ বছর

গ. ১২,০০০ বছর ঘ. ১৩,০০০ বছর

২। যাযাবররা নিম্নের কোন্ শ্রেণীর পশু পালন করেনা?
ক. উট খ. ভেড়া
গ. গরু ঘ. মেষ

৩। নিম্নের কোন্টি স্থানন্তরিত কৃষি ফসল নয়?
ক. ধান খ.পাট
গ. ভুট্টা ঘ. যোয়ার

৪। নিম্নের কোন্টি স্বয়ং ভোগী কৃষি ফসল নয়?
ক. আপেল খ. কফি
গ. রাবার ঘ. কোকো

৫। নিবিড় কৃষি ব্যবস্থায় বছরে সর্বোচ্চ কয়বার ফসল উৎপাদন হয়?
ক. ২ বার খ. ৩ বার
গ. ১ বার ঘ. ৪ বার

৬। বিশ্ব কৃষি ব্যবস্থাকে প্রধানত: কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৫ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৩ ভাগে ঘ. ২ ভাগে

৭। ধান বিহীন নিবিড় কৃষি ব্যবস্থায় নিম্নের কোন শস্য উৎপাদন হয়?
ক. গম খ. তুলা
গ. ইক্ষু ঘ. সবগুলো

৮। ভূমধ্যসাগর কৃষি ব্যবস্থায় গ্রীষ্মকালে কোন্ শস্য উৎপাদন হয় না?
ক. ধান খ. তুলা
গ. তামাক ঘ. বীট

৯। বাণিজ্যিক পশু চারণ খামারে নিম্নের কোন্ পশুর প্রাধান্য নেই?
ক. উট খ. গরু
গ. ভেড়া ঘ. ঘোড়া

১০। নিম্নের কোন্ দেশটিতে বাণিজ্যিক গব্য ফার্মিং নেই?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. অষ্ট্রেলিয়া
গ. নিউজিল্যান্ড ঘ. ভারত

পাঠ- ৩ খাদ্য ফসল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শস্যের নাম বলতে পারবেন
- বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শস্যের ব্যাবহার বর্ণনা করতে পারবেন
- বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শস্যের উপযোগী অনুকূল অবস্থা আলোচনা করতে পারবেন
- বিভিন্ন প্রকার খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- খাদ্য শস্যের বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ধান (Paddy)

ধান একটি অতি প্রাচীন কৃষি ফসল। পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশী ধানের চাষ হয়। প্রথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য ধান। ধান থেকে চাল করে তা ব্যবহার করা হয়। এশিয়ার মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলেই বেশীরভাগ ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ধানের ব্যবহার ও গুরুত্ব ঃ খাদ্য হিসেবে ধানই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়। নিম্নে ধানের বহুমুখী ব্যবহার বর্ণনা করা হলোঃ

১. ধান থেকে চাল তৈরী করে। চাল থেকে ভাত তৈরী করে যা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য।
২. চাল দ্বারা মুড়ি, চিড়া, বিভিন্ন পিঠা প্রভৃতি তৈরী করা হয়।
৩. চাউলের ভাত পুষ্টিকর। সহজ পাচ্য এবং সুস্বাদু খাদ্য।
৪. ধান গাছের খড় পশু খাদ্য ও খড়ের বেড়া ও চাল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
৫. ভাতের মাড় পশু খাদ্য, কাপড়ে প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়।
৬. চাউল থেকে মদ, শ্বেতসার প্রভৃতি তৈরী হয়।
৭. ধানের খোসা পশুর খাদ্য, জ্বালানী, গদি তৈরী প্রভৃতিতে ব্যবহার করে।
৮. ধানের তুষ সিমেন্টের সাথে মিশিয়ে সিনেমা হলের দেওয়ালে ও অডিটরিয়ামের দেওয়ালে প্রলেপন দিয়ে শব্দ নিরোধক কাজে ব্যবহার করে।

ঋতু ভিত্তিক উৎপাদন অনুসারে ধানের শ্রেণী বিভাগ

ঋতু ভিত্তিতে ধানকে আউশ, আমন ও বোরো এ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নিম্নে ঋতু ভিত্তিক ধানের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করা হলোঃ

১। আউস ধান ঃ এপ্রিল-মে মাসে বপন পদ্ধতিতে আউস ধান চাষ করা হয় এবং জুলাই-আগষ্টে ধান কাটা হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আউস ধানের চাষ বেশী।

২। আমন ধান ঃ বর্ষার শুরুতে বপন পদ্ধতিতে ধান চাষ করে এবং শীতকালে ধান কাটে। নিম্নভূমি বা জলাভূমিতে আমনধান চাষ হয়। এ ধানের ফলন বেশী। পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলে এ ধানের চাষ হয়।

৩। বোরো ধান ঃ এ ধানের চারা শীতকালে নদীর তীরে বা জলাভূমিতে রোপন করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে কাটা হয়। এ ধরনের ধানের ফলন অনেক বেশী হয়।

ধান চাষের অনুকূল উপাদানসমূহ

ধান চাষ মূলত: প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। তবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ও ধান চাষের উপর প্রভাব আছে। নিম্নে উভয় প্রকার উপাদান আলোচনা করা হলোঃ

প্রাকৃতিক উপাদান ঃ নিম্নে ধান চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক উপাদানগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১। জলবায়ু ঃ ধান চাষে জলবায়ুর প্রভাব অত্যধিক। জলবায়ুর মধ্যে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ প্রধান উপাদান।

(র) বৃষ্টিপাত ঃ ধান চাষের জন্য ১০০-৩৬৫ সে.মি. বৃষ্টি প্রয়োজন। ১০০ সে.মি. এর নিচে বৃষ্টি হলে সেচ প্রয়োজন হয়। ধান পাকা পর্যন্ত ক্ষেতে পানি প্রয়োজন হয়।

(রর) উত্তাপ ঃ ধান উষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। ধানে ১০°-২৭° সে. উত্তাপের প্রয়োজন হয়। বীজ গজানর জন্য ২০° সে. উত্তাপ প্রয়োজন। চারা বৃদ্ধির জন্য ২১°-২৪° সে. উত্তাপ দরকার। শীষ বের হবার সময় ২০° সে. কম উত্তাপ। ধান পাকা ও কাটার সময় ২৭° সে. বা তার বেশী উত্তাপ প্রয়োজন।

২। মাটি ঃ পলিমাটিতে ধান চাষ ভাল হয়। পানি ধরে রাখতে পারে এমন মাটি ধানের জন্য উপযোগী। তাই পৃথিবীর বেশীর ভাগ নদী উপত্যাকা ও নদীর ব-দ্বীপসমূহ ধান চাষের প্রধান কেন্দ্র।

৩। ভূ-প্রকৃতি ঃ ধান চাষের জন্য সমতল ভূমি বেশী উপযোগী।

৪। নদ-নদী ও খালের অবস্থান ঃ নদ-নদীর পাশে প্রতি বছর পলি মাটি পড়ে বলে ধান চাষ ভাল হয়। তাই দেখা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন নদ-নদীর অববাহিকায় ধান ভাল হয়।

খ. অর্থনৈতিক উপাদান ঃ ধান চাষের জন্য নিম্নে বর্ণিত অর্থনৈতিক উপাদানগুরো প্রয়োজন হয়:

১। মূলধন ঃ ধান চাষের জন্য প্রচুর মূলধান প্রয়োজন। চাষের পশু, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরী বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়।

২। শ্রমিক ঃ ধান চাষের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ধান, রোপন/বপন, আগাছা পরিস্কার, তত্বাবধান করা, কর্তন, মাড়াই, গোলাজাতকরণ, স্থানান্তর করা প্রভৃতি কাজে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

৩। বাজার ঃ ধানের চাহিদা থাকলে ধান বেশী উৎপাদন করে। আবার চাহিদা কম থাকলে কম উৎপাদন করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জনবসতি ঘন বলে ধানের চাহিদা বেশী থাকায় এ অঞ্চলে অধিক পরিমান ধান উৎপাদন হয়।

৪। পরিবহন ব্যবস্থা ঃ পরিবহন ব্যবস্থা ধান চাষের জন্য প্রয়োজন। শ্রমিক, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি যাতায়াত ও ধান কেটে আনার জন্য পরিবহন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার সমুদ্র পথে ধান পরিবহনের সুবিধা থাকায় থাইল্যান্ড, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট, মায়ানমার, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ ধান রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে। তাই পরিবহন ব্যবস্থাও ধান চাষের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে।

৫। অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদান ঃ উচ্চ ফলশীল বীজ, সার, কিটনাশক, পানি, সেচ ব্যবস্থা, গবাদিপশু, যন্ত্রপাতি, ধান সংরক্ষনের ব্যবস্থা ইত্যাদিও ধান চাষের জন্য যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ) সাংস্কৃতিক উপাদান

১। বীজ ঃ উন্নত বীজ ধান চাষের ফলন বৃদ্ধি করে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল বীজ আবিষ্কার করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ধান গবেষণাকেন্দ্র উচ্চ ফলনশীল ধান উদ্ভাবন করে দেশে ধানের ফলন যথেষ্ট বৃধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

২। সার ঃ অধিক ফলনের জন্য রাসায়নিক ও জৈবিক সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও কীট নাশক, সেচ ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং ধানের সংরক্ষনও ধান চাষের সহায়ক। বর্তমানে এ ধরনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। সরকারী উদ্যোগ ঃ ধান চাষে উৎসাহিত করার জন্য সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকারী সাহায্য দেয়া হয়। বাংলাদেশেও কৃষিতে ভর্তূকি দিয়ে আসছে। ফলে দেশে ধানের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বের ধান উৎপাদন ও বন্টন

পৃথিবীর সব মহাদেশে ধান উৎপাদন হলেও এশিয়া মহাদেশে অধিক পরিমান ধান উৎপাদন হয়। ২০০০ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করে মোট ৫৯ কোটি ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশে ৫৪ কোটি মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়, যা পৃথিবীর মোট ধান উৎপাদনের ৯০.১১ ভাগ। নিম্নে মহাদেশ অনুযায়ী বিশ্বের ধান উৎপাদন বর্ণনা করা হলো।

চিত্র ১ ঃ পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল

মহাদেশ ভিত্তিক ধান উৎপাদন ২০০০

মহাদেশ	জমি (কোটি হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হেঃ)	মোট ফলন (কোটি মে.টন)
এশিয়া	১৩.৭২	৩৯৩৪	৫৪.০০
দক্ষিন আমেরিকা	০.৫৭	৩৫৪৫	২.০২
আফ্রিকা	০.৭৭	২২০৬	১.৭০
উত্তর আমেরিকা	০.১৯	৫৫৬০	১.১১
ইউরোপ	০.০৬	৫০৩৮	০.৩১
ওসেনিয়া	০.০১	৯১৮২	০.১৩
বিশ্বে মোট	১৫.৩৪	৩৮.৬৩	৫৯.২৯

উৎস ঃ FAO বুলেটিন, ২০০০, ভলিউম- ১, সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা- ১২-২৩।

এশিয়া মহাদেশ

এ মহাদেশে ১০০০ সালে প্রায় ১৩.৭২ কোটি হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং মোট প্রায় ৫৪ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। বিশ্বের ১০টি প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ৯ টিই এশিয়া মহাদেশে। এশিয়ার প্রধান প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশগুলো মধ্যে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

চীন ঃ এ দেশটি বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। এ দেশে বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩৫ ভাগ ধান উৎপাদন হয়। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫ থেকে ৬ মে.টন। ২০০০ সালে ৩.১৬ কোটি হেক্টর জমিতে ১৯.০৪ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। চীনে ধান চাষে উন্নতি লাভ করার পেছনে উর্বর পলল মৃত্তিকা, অনুকূল জলবায়ু, সস্তা শ্রমিক, মূলধনের প্রাচুর্যতা, রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, ব্যাপক চাহিদা, কমিউন পদ্ধতিতে চাষাবাদ প্রভৃতি কারণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

চীনের সর্বত্র ধান চাষ হলেও অধিকাংশ ধান দক্ষিন ও মধ্যচীনে ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা, দক্ষিন পূর্বের উপকূলভাগ ও হেচুয়ান অববাহিকায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। চীনের হুনান প্রদেশ ধান চাষে প্রখ্যাত। এ অঞ্চলে সবচেয়ে ফলন বেশী, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় না। তাই এ স্থানকে ধানের আধার বলা হয়। চীন বর্তমানে চাল রপ্তানি করে।

নির্বাচিত দেশের ধানের উৎপাদন- ২০০০

দেশ	জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হেঃ)	মোট ফলন (কোটি মেট্রিক টন)
চীন	৩০৫.০৮	৬২৪১	১৯.০৪
ভারত	৪৪৬.০০	৩০২৭	১৩.৫০
ইন্দোনেশিয়া	১১৫.২৩	৪৪২৬	৫.১০
বাংলাদেশ	১০৪.৭০	২৮৫২	২.৯৮
ভিয়েতনাম	৭৬.৫০	৪১৮৩	৩.২০
থাইল্যান্ড	১০০.০০	২৩৪০	২.৩৪
মায়ানমার	৬০.০০	৩৩৩৩	২.০০
জাপান	১৮.০০	৬৫২৮	১.১৭
ফিলিপাইন	৩৯.০০	৩২০৫	১.২৫
ব্রাজিল	৩৬.৩৪	৩০১০	১.০৯
যুক্তরাষ্ট্র	১২.৩৯	৬৯৬৩	০.৮৭
দক্ষিন কোরিয়া	১০.৫৯	৬৬৬৮	০.৭২
পাকিস্তান	২২.৫০	২৮৬৭	০.৬৪
মিশর	৬.৬০	৮৪৮৫	০.৫৬
নাইজেরিয়া	২০.৬১	১৫৯০	০.৩৩

উৎস ঃ FAO বুলেটিন, ২০০০, ভলিউম- ১, সংখ্যা- ২, পৃ: ২২-২৩

ভারত ঃ ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের ২৩ ভাগ ধান এদেশে উৎপাদিত হয়। ২০০০ সালে এ দেশে ৪৪৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করে ১৩.৫০ কোটি মে:টন ধান উৎপাদন করে। দেশের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন আড়াই থেকে তিন মেট্রিক টন।

শুধুমাত্র রাজস্থানের মরুভূমি ব্যাতিত অন্যান্য সকল স্থানে ধান উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, তামিলনাড়ু, বিহার ও উড়িষ্যায় দেশের মোট উৎপাদনের ৬৫% ধান উৎপন্ন হয়।

এদেশের মৌসুমী জলবায়ু, উর্বর সমভূমি, সস্তা শ্রমিক, ব্যাপক দেশীয় চাহিদা, কম উৎপাদন ব্যয়, সরকারী সাহায্য প্রভৃতি অনুকূল পরিবেশের কারণে ভারত ধান চাষে উন্নতি সাধন করেছে। আগে চাল আমদানী করতে হলেও বর্তমানে উদ্বৃত্ত থাকে। এ দেশে প্রগাঢ় ও ব্যাপক উভয় প্রকার পদ্ধতিতে আউস ও আমন ধান চাষ হয়। তবে সেচের মাধ্যমে বোরো ধানও চাষ করে।

ইন্দোনেশিয়া ঃ এটি ধান উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় স্থানের অধিকারী। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪ মেট্রিক টনেরও অধিক। ২০০০ সালে ১১৫ লক্ষ হেক্টরে ধান চাষ করে মোট ৫.১০ কোটি মেঃটন ধান উৎপাদন করে যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৯ ভাগ। এ দেশে নিবিড়ভাবে ধানের চাষ করা হয়। প্রধান ধান উৎপাদন কেন্দ্র হলো জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপ। এছাড়ও কালিমান্তান, সুলাওয়েসি এবং ইরিয়ান আয়া প্রভৃতি দ্বীপেও ধান চাষ করে। প্রচুর ধান উৎপাদন সত্বেও বিদেশ থেকে চাল আমদানী করতে হয়।

বাংলাদেশ ঃ ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য। দেশের আবাদী জমির প্রায় ৯০ ভাগে ধান উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি আড়াই মেট্রিক টন অপেক্ষা একটু বেশী। ২০০০ সালে ১.০৪ কোটি হেক্টর জমিতে প্রায় ২.৯৮ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। এখানে মৌসুমী জলবায়ু এবং নদী বিধৌত পলল সমভূমি ধান চাষের উপযোগী। প্রায় আড়াই হাজার বছরের ধান চাষের ঐতিহ্য রয়েছে এদেশে। ভাত এদেশের প্রধান খাদ্য। বাংলাদেশে আউস, আমন ও বোরো ধান উৎপাদন হয়। বছরে অন্তত ২টি ধান হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবে কোন বছর খরা বা বন্যার কারণে উৎপাদন কম হলে আমদানী করতে হয়।

ভিয়েতনাম ঃ এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন সাড়ে চার মে:টন। ২০০০ সালে এদেশে মোট ৭৬.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট ৩.২০ কোটি মেঃটন ধান উৎপাদন হয়। আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি ধান উৎপাদনে সহায়ক। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মেকং বদ্বীপ এবং উত্তরের হং (রড) দো (ব্রাক) নদীর ব-দ্বীপে ধানের ব্যাপক চাষ হয়। এ দেশটি অভ্যান্তরিন চাহিদা পূরন করে বিদেশে রপ্তানি করে।

থাইল্যান্ড ঃ এটি বিশ্বের ষষ্ঠ ধান উৎপাদন কারী দেশ। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২ মে:টনের বেশী। ২০০০ সালে ১০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২.৩৪ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। এদেশের সুবিস্তৃত মেনাম নদীর উপত্যকা এবং ব-দ্বীপ সমভূমির অংশ ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে এদেশটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চাল রপ্তানিকারক দেশ। থাইল্যান্ড প্রতিবছর প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করে থাকে।

মায়ানমার ঃ এটি বিশ্বের ৭ম প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩ মেট্রিক টন। ২০০০ সালে ৬০ লক্ষ হেক্টরে ২.০০ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে। দেশের ইরাবতী, সালউইন, চিন্দুইন, তিনাসিবিম প্রভৃতি নদীর উপত্যাকা ও বদ্বীপ এবং আরাকানের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। মায়ানমার দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর চাল রপ্তানি করে। তবে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে দিনদিন রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে।

জাপান ঃ জাপান বিশ্বের অন্যতম ধান উৎপাদনকারী দেশ। এদেশ যান্ত্রিক চাষের মাধ্যমে উৎপাদন অনেক বেশী করতে সক্ষম হয়েছে। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৬.৫৩ মেট্রিক টন। ২০০০ সালে এ দেশে ১৮.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১.১৭ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে।

এ দেশের হনসু দ্বীপের উপকূলের সমভূমি এবং পাহাড়ে সৃষ্ট সোপান ভূমিতে ধান চাষ হয়। জাপান দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে খুব কম পরিমান রপ্তানি করে।

ফিলিপাইন ঃ এদেশের গড় উৎপাদন আড়াই থেকে তিন মেট্রিক টন। ২০০০ সালে এদেশে ৩৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১.২৫ কোটি মে.টন ধান উৎপাদন হয়। এদেশের লুজন দ্বীপের সমভূমি এবং পাহাড়ে সৃষ্ট সোপান ভূমিতে ধানের চাষ হয়। এদেশ নিজস্ব চাহিদা পূরনের জন্য ধান চাষ করে।

দক্ষিণ কোরিয়া ঃ এটি এশিয়ার দশম ও বিশ্বের দ্বাদশ ধান উৎপাদনকারী দেশ। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৬ মেট্রিক টন অপেক্ষা বেশী। ২০০০ সালে ১০.৫৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৭২ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে। এদেশে যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ হয়। দেশে চাহিদা বেশী থাকায় সীমিত পরিমান চাল আমদানী করতে হয়।

অন্যান্য দেশ ঃ পাকিস্তান, ইরাক, নেপাল, শ্রীলংকা, লন্ডন, কম্বোডিয়া প্রভৃতি এশিয়ার দেশেও ধান উৎপাদন হয়।

খ) দক্ষিন আমেরিকা ঃ এ মহাদেশ বিশ্বের প্রায় ৩.৪০ ভাগ ধান উৎপাদন করে। ২০০০ সালে ৫৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২.০২ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৩.৫৪ মেট্রিক টন। ব্রজিল প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ।

১। ব্রজিল ঃ দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশ। ব্রাজিল পৃথিবীর অন্যতম ধান উৎপাদনকারী দেশ। আমান নদীর উপত্যকা এবং আটলান্টিক উপকূল ধানচাষের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রচুর বৃষ্টিপাতও জমির উর্বরতা ধান চাষের জন্য সহায়ক। ২০০০ সালে ১২.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়।

এ দেশের পারানা নদী সন্নিহিত সওপাওলো এবং সর্বদক্ষিনে বৃষ্টিবহুল রিওগ্রান্তি-ডো-সুল অঙ্গ রাজ্যে বেশীর ভাগ ধান হয়। ব্রাজিল অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে চাল আমদানী করে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া, পেরুগুয়ে, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশে অল্প পরিমান ধান উৎপাদন হয়।

গ) আফ্রিকা

মিশর ঃ এদেশে অল্প পরিমান জমিতে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় সাড়ে আট মেট্রিক টন। ২০০০ সালে ৬.৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়। এদেশের নীল নদের উপত্যকা এবং এর ব-দ্বীপ এলাকায় ধান চাষ হয়। এদেশ প্রতি বৎসর প্রচুর চাল রপ্তানি করে।

২। মাদাগাসকার ঃ এটি আফ্রিকা মহাদেসের দ্বিতীয় প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২ মেট্রিকটনের বেশী। ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। তবে এদেশ বিদেশ থেকে চাল আমদানী করে স্থানীয় চাহিদা পূরন করে।

৩। নাইজেরিয়া ঃ এটি আফ্রিকার ৩য় প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। এদেশে প্রায় ২১ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। প্রধানত নাইজার নদীর অববাহিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ধান চাষ হয়। নাইজেরিয়া স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় বিদেশে চাল রপ্তানি করে।

৪। অন্যান্য দেশ ঃ আফ্রিকার অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে দক্ষিন আফ্রিকা, কংগো, এ্যাংগোলা, গিনি, সিয়ের লিয়োনা, সেনেগাল, আলজেরিয়া, সুদান, কেনিয়া, মুজাম্বিক ইত্যাদি অন্যতম।

ঘ) উত্তর আমেরিকা ঃ এ মহাদেশ ২০০০ সালে ১৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করে মোট ১.১১ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে। এ মহাদেশের বেশীর ভাগ ধান যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়।

১। যুক্তরাষ্ট্র ঃ এটি বিশ্বের একাদশতম ধান উৎপাদনকারী দেশ। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৬.৫ মেট্রিক টন। ২০০০ সালে এ দেশে ১২.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। প্রধান ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো মিসৌরী ও মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ এলাকা এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও মেক্সিকো সাগরের বিস্তীর্ন উপকূল। এদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ধান চাষ হয়। তাই এদেশ প্রচুর চাল বিদেশে রপ্তানি করে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ উত্তর আমেরিকার ডেমিনিকান প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে স্বল্প পরিমান ধান উৎপন্ন হয়।

ঙ) ইউরোপ ঃ এমহাদেশের বেশীর ভাগ ধান উত্তর ইতালির বৃষ্টি বহুল পো নদীর উপত্যাকায় হয়। ২০০০ সালে ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি গড়ে পাঁচ মেট্রিকটনের বেশী ধান উৎপন্ন হয়।

১। ইতালি ঃ এটি ইউরোপীয় প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। ২.৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। এদেশ পানি সেচের মাধ্যমে ধান চাষ করে। এদেশের পো নদীর অববাহিকায় সবচেয়ে বেশী ধান উৎপাদন হয়। ইতালি একটি চাল রপ্তানিকারক দেশ।

২। স্পেন ঃ এটি ইউরোপের দ্বিতীয় প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। এব্রো নদীর উপত্যাকা ও উপকূলীয় অঞ্চলে ধান চাষ হয়। ১.১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করে প্রায় ৭.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়। এদেশ পানি সেচের মাধ্যমে ধান চাষ করে।

৩। রুশ ফেডারেশন ঃ এদেশে প্রায় ১.৭২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়। প্রতি বছর প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। ধান চাষকারী অঞ্চল হলো আমু নদীর উপত্যকা এবং কৃষ্ণ সাগরের তীর অঞ্চল।

চ) ওসেনিয়া ঃ এ মহাদেশ ২০০০ সালে ১.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করে ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন করে। হেক্টর প্রতি ৯.১৮ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়। এ মহাদেশের অষ্ট্রেলিয়া প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ। এদেশ বিদেশে প্রচুর চাল রপ্তানি করে। এছাড়া পাপুয়া নিউগিনি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েকটি দ্বীপে স্বল্প পমিান ধান উৎপন্ন হয়।

চালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

বিশ্বের মোট উৎপাদনের মাত্র ৪ থেকে ৫ ভাগ চাল বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়। ১৯৯৯ সালে ৫৮.৬৮ কোটি মেঃটন ধান থেকে ৩৯ কোটি মেঃ টন চাল উৎপন্ন হয়। বিশ্ববাজারে মাত্র ১.৮৬ কোটি মেঃ টন রপ্তানি হয়। ধান আবাদকারী দেশগুলোর যাদের জন সংখ্যা কম তারা বিদেশে রপ্তানি করে। যেমন, থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও ভিয়েতনাম প্রচুর চাল রপ্তানি করে। আবার চাল কম নির্ভর দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ইতালি, উরুগুয়ে, অষ্ট্রেলিয়া চাল রপ্তানি করে। প্রধান আমদানী কারক দেশগুলোর মধ্যে ইরাক, ইরান, ব্রাজিল, জাপান, সৌদীআরব, দক্ষিন আফ্রিকা, সেনেগাল, কিউবা, আইভরী কোষ্ট প্রভৃতি উল্লেযোগ্য।

গম

গমের উৎপত্তি ঃ খাদ্য শস্য হিসেবে গমের ব্যবহার অতি প্রাচীন। গমের সুনির্দিষ্ট উৎপত্তি না জানা গেলেও এ বিষয়ে সকলে একমত যে সর্ব প্রথম ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে কোন এক স্থানে গমের চাষ শুরু হয়। অনেকে মনে করে থাকে যে এশিয়া মাইনর (তুরস্ক) এবং মধ্য প্রাচ্যে প্রথম গমের চাষ শুরু হয়। পরবর্তিতে ভূমধ্যসাগরের দেশসমূহে এবং ইউরোপে গম চাষ বিস্তার লাভ করে। ইউরোপীয়রা আমেরিকাতে বসতি স্থাপনের পর আমেরিকায় গম চাষ বিস্তার লাভ করে।

গমের ব্যবহার ঃ গম মানবগোষ্ঠির অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। গমের পুষ্টি চাল অপেক্ষা বেশী। গম আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতে রূপান্তর করে রুটি, বিস্কুট, কেক, পাউরুটি তৈরী করে মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। গমের ভূষি পশু-পাখী, হাস-মুরগীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। গমের খড় দ্বারা কাগজ, কাগজের মন্ড, বিছানার গদি, খরের ছাউনী প্রভৃতি তৈরী হয়। গমের খড় জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। নিকৃষ্ট মানের গম পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। গমে প্রচুর প্রোটিন ও কার্বহাইড্রেড উভয়ই বিদ্যমান।

গমের শ্রেণী বিভাগ ঃ গমের বপন ও কর্তন করার সময় অনুযায়ী গমকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা- বসন্তকালীন ও শীতকালীন গম।

ক) যে সকল দেশে প্রচন্ড শীত এবং শীতে তুষার পাত হয় সে সকল স্থানে বসন্ত কালে গম চাষ করা হয়। উদাহরণ সরূপ বলা যায় রাশিয়া, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এ ধরনের গম চাষ হয়।

খ) পক্ষান্তরে যে সকল দেশের জলবায়ু উষ্ণ ভাবাপন্ন, সে সকল দেশে শীতকালের পরিবর্তে গ্রীষ্মে গম কর্তন করে।

গমচাষ কার্যক্রম

বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই যান্ত্রিক উপায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ করা হয়। প্রথমে জমি তৈরী করে, তারপর যান্ত্রিক উপায়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। পাকার পর গম কাটার জন্য কম্বাইন-হার্বেষ্টার ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে গমকাটা, পরিস্কার করা ও বস্তাজাতকরন সম্পন্ন করা হয়। ফলে গম চাষে কম সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হয়। গমে পানি সেচের প্রয়োজন হয়। ভাল নিস্কাশন ব্যবস্থাসহ সুবিস্তৃত উচু সমতল এলাকায় যান্ত্রিক উপায়ে গম চাষ অধিক লাভজনক।

গম চাষের ভৌগলিক উপাদানসমূহ

গমচাষের অনুকূল উপাদানগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। প্রাকৃতিক উপাদান, ২। অর্থনৈতিক উপাদান এবং ৩। সাংস্কৃতিক উপাদান। নিম্নে এসব উপাদানের বর্ণণা দেয়া হলোঃ

ক) প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

জলবায়ু ঃ গম চাষের জন্য জলবায়ু খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জলবায়ুর মধ্যে উত্তাপও বৃষ্টিপাতই প্রধান যা গমের মান ও উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।

(i) উষ্ণতা ঃ সাধারনত ঃ ১০° থেকে ২৭° সে. উত্তাপ গম চাষের জন্য প্রয়োজন। চারা বৃদ্ধির জন্য প্রথম দিকে ১০°-১৫° সে. উষ্ণতা, গাছের বৃদ্ধি ও শীষ বের হবার সময় ১৫°-২০° সে. এবং ফলন কাটা ও পাকার সময় ২০°-২২° সে. তাপমাত্রায় গমের ফলন ভাল হয়।

(ii) বৃষ্টিপাত ঃ গম চাষের জন্য বেশী পানির প্রয়োজন হয় না। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টপাত ৩০ হতে ১০০ সেন্টিমিটার সেখানে গম চাষ করার উপযোগী। ৩০ সে.মি. এর নীচে বৃষ্টিপাত হলে সেচ প্রয়োজন হয়। আবার ১০০ সে.মি. এর বেশী বৃষ্টিপাত গমের জন্য ক্ষতিকর। তবে তুষার ও কুয়াসা গম চাষের জন্য প্রতিকূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২। ভূ-প্রকৃতি ঃ গম চাষের জন্য সমতল বিস্তৃত এলাকা প্রয়োজন। সমতল জমিতে সেচ প্রদান করা সহজ। ভূমির আকার বড় হলে যান্ত্রিক চাষ প্রয়োগ করা যায়।

৩। মাটি ঃ দোয়াস মাটিতে গম উৎপাদন ভাল হয়। অর্থাৎ যে মাটিতে বালি ও কাদা বা পলির পরিমান সর্বত্র সমান থাকে সে মাটিতে গম ভাল হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দোয়াস মাটিতে গম ভাল চাষ হয়।

খ) অর্থনৈতিক উপাদান

১। মূলধন ঃ গম চাষের জন্য পশু বা যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের মজুরী, সেচ খরচ, পরিবহন খরচ, বাজার জাত করন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

২। শ্রমিক ঃ অনুন্নত দেশে বীজ বপন থেকে শুরু করে, বাজার জাতকরন পর্যন্ত সকল কাজেই শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তবে উন্নত দেশে যন্ত্রের সাহায্যে অধিকাংশ কাজ করা হয় বলে মজুরী কম প্রয়োজন হয়। তার পরও যন্ত্রচালনা, ফসল সংরক্ষন, বাজারজাত করন প্রভৃতি কাজে দক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়।

৩। গম চাষের জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকা প্রয়োজন। চাহিদা কম হলে উৎপাদন কম হয়। চাদিা বেশী থাকলে উৎপাদন বেশী হয়। তাই বাজারের চাহিদা গম উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে।

৪। পরিবহন ঃ কৃষি ক্ষেত্রে বীজ, সার, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ও কীট নাশক দেয়া এবং ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাত করার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হওয়া প্রয়োজন। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার কারনে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে গম উৎপাদনে উন্নতি লাভ করেছে।

৫। অন্যান্য ঃ গম উৎপাদনের জন্য উন্নত বীজ, সার, সেচ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রয়োজন হয়।

গ) সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ

১। রাজনৈতিক কারণ ঃ অনেক উন্নতদেশ রাজনৈতিক কারণে গম চাষ করে। রাজনৈতিক কারণে গম রপ্তানি হ্রাস পেলে গম উৎপাদন হ্রাস পায়। তাই গম উৎপাদনে রাজনৈতিক প্রভাব আছে।

২। সরকারী উদ্যোগ ঃ সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে সরকারী উদ্যোগ বেশ গুরুত্বপূর্ন। সরকারীভাবে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকার গম চাষে সরকারী সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

৩। অন্যান্য ঃ অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে উন্নত বীজ, কীট নাশকের ব্যবহার, সার প্রয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পানি সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নত গম চাষের জন্য উপযোগী।

বিশ্বের গম উৎপাদনের বর্ণনা

বিশ্বের অধিকাংশ গম মহাদেশ সমূহের উপক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে উৎপন্ন হয়। বিশ্বের মোট উৎপাদনের মধ্যে এশিয়া ৪২%, ইউরোপ ৩২%, উত্তর আমেরিকা ১৫%, দক্ষিণ আমেরিকা ৩% এবং ওসেনিয়া ও আফ্রিকা অবশিষ্ট গম উৎপাদন করে। ২০০০ সালের এক হিসাবে বিশ্বে মোট ২১.৫১ কোটি হেক্টর জমিতে ৫৮.২২ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়।

চিত্র ২ ঃ পৃথিবীর গম উৎপাদক অঞ্চল

নিচে মহাদেশ ভিত্তিক বিশ্বের গম উৎপাদনের বিবরন দেয়া হলোঃ

মহাদেশ অনুযায়ী গম উৎপাদন- ২০০০

মহাদেশ	জমি (কোটি হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হেঃ)	মোট ফলন (কোটি মেঃটন)
এশিয়া	৯.৬৮	২২৬৬	২৪.৮৩
ইউরোপ	৫.৭৪	৩২৪৮	১৮.৬৫
উত্তর আমেরিকা	৩.২৮	২৭৫৪	৯.১৬
দক্ষিন আমেরিকা	০.৮১	২৩৮৪	১.৯৩
ওসেনিয়া	১.১৫	১৯৪৮	২.২৪
আফ্রিকা	০.৮৫	১৬৩২	১.৩৯
বিশ্বেমোট	২১.৫১	২৭০৬	৫৮.২২

উৎস ঃ FAO বুলেটিন- ২০০০ ভলিউম- ১, সংখ্যা- ২, পৃঃ ২০-২১।

নির্বাচিত দেশের গমের উৎপাদন- ২০০০

মহাদেশ	জমি লক্ষ মেঃটন	গড় ফলন কেজি/হেঃ	মোট ফলন কোটি মেট্রিক টন
চীন	২৬৫.০১	৩৮০৮	১০.০৯
যুক্তরাষ্ট্র	২২০.৩৩	২৮১২	৬.১৯
ভারত	২৬৭.৪২	২৬২১	৭.০১
ফ্রান্স	৫২.৫৬	৭১০৪	৩.৭৩
রুশ ফেডারেশন	২৩২.০০	১৫৯৫	৩.৭০
কানাডা	১০০.০০	২৬২০	২.৬২
অষ্ট্রেলিয়া	১১৫.০০	১৯৩১	২.২২
তুরস্ক	৮৬.৫০	২০৮১	১.৮০
জার্মানি	২৯.৭১	৭১৫৮	২.১২
পাকিস্তান	৮৪.৬২	২৪৯৩	২.১১
যুক্তরাজ্য	২১.০০	৭৮৭১	১.৬৫
ইউক্রেন	৫৬.৫০	২২৪৮	১.২৭
ইরান	৫৫.০০	১৬৮২	০.৯২
আর্জেন্টিনা	৬১.০০	২৪৫৯	১.৫০

উৎস ঃ FAO ত্রৈমাসিক বুলেটিন- ২০০০, ভলিয়ম- ১, সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা ২০-২১।

ক) এশিয়া ঃ এ মহাদেশে ২০০০ সালে প্রায় ৯.৬৮ কোটি হেক্টরে ২৪.৮৩ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। এটি গম উৎপাদনে মহাদেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। বিশ্বের প্রায় ৪২ ভাগ গম এ মহাদেশে উৎপন্ন হয়।
এশিয়ার চীন, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদনকারী দেশ।

১। চীন ঃ চীন বর্তমানে গম উৎপন্নকারী দেশ হিসেবে বিশ্বের প্রথম স্থানের অধিকারী। বিশ্বের মোট গম উৎপাদনের প্রায় ১৭% একক ভাবে এ দেশে উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি গম উৎপাদন তিন থেকে সাড়ে তিন মেট্রিক টন। ২০০০ সালে ২.৬৫ হেক্টর জমিতে গম চাষ করে প্রায় ১০.০৯ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে। ধানের পরে গমের উৎপাদন। এদেশে শীতেই অধিকাংশ (৯০%) গম উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে মাত্র ১০ ভাগ গম উৎপাদন হয়। শীতকালে চীনের হোয়াংহো অববাহিকায় অবস্থিত হেনান, শ্যান্দং ও হিবেই প্রদেশ এবং আনহুই প্রদেশে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয়। এছাড়া হুয়াংহো অববাহিকায় অবস্থিত সানজি এবং ইয়াংসি অববাহিকায় অবস্থিত জিয়াংসু সিচুয়াংএ শীতকালে গম হয়। বসন্ত কালে শীত প্রধান এলাকায় হেইজংজিয়াং, গানসু, অন্তর্মোঙ্গলিয়া ও পশ্চিমের ঝিনজিয়াং ও কিংহাই প্রদেশে গম উৎপন্ন হয়। চীনে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গম চাষ করা হয়।

জনসংখ্যা বেশী হবার কারণে অভ্যান্তরীন চাহিদা পূরনের জন্য বিদেশ থেকে গম আমদানী করতে হয়।

২। ভারত ঃ ভারত বর্তমানে পৃথিবীর ২য় প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে ভারত ২.৬৭ হেক্টর জমিতে প্রায় ৭.০১ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে। যা বিশ্বের মোট গম উৎপাদনের প্রায় ১২ ভাগ।

এ দেশেও ধানের পরই গমের স্থান। এ দেশে শীত কালে গমের চাষ করা হয়। ভারত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা এবং পশ্চিমে গুজরাট হতে পূর্ববিহার পর্যন্ত গম চাষ করে। ভারত নিজস্ব চাহিদা পূরন করতে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা এবং অষ্ট্রেলিয়া হতে গম আমদানী করে।

৩। পাকিস্তান ঃ পাকিস্তান এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় এবং বিশ্বের নবম গুরুত্ব পূর্ন গম উৎপাদনকারী দেশ। এদেশ ২০০০ সালে ২.১১ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে। এ দেশে শীতকালে গম চাষ হয়। গম এদেশের প্রধান খাদ্য। এদেশ গমের চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সেচের মাধ্যমে গম চাষ হয়। পাকিস্তান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাকিস্তান বিশ্বের মোট গমের প্রায় ৩.০৯ ভাগ উৎপন্ন করে।

৪। তুরস্ক ঃ তুরস্ক এশিয়া মহাদেশের মধ্যে চতুর্থ এবং বিশ্বের দশম গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে ৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১.৮০ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩ ভাগ। তুরস্ক নিজস্ব চাহিদা

মিটিয়ে প্রতি বছর বিদেশে গম রপ্তানি করে। প্রধানত: ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু বেশী পরিমান গম উৎপাদনের কারণ। এদেশের ইজমির ও আনাতলীর মালভূমি এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় গম চাষ হয়।

৫। কাজাকিস্তান ঃ এদেশের প্রধান ফসল গম। ২০০০ সালে এদশে ১ কোটি হেক্টর জমিতে ১ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে। এদেশের উরাল, ইশিম ও সিব নদীর অববাহিকায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। এছাড়া বলকান হ্রদ ও আরল সাগর অঞ্চলেও পানি সেচের মাধ্যমে বেশ গম উৎপাদন হয়।

৬। ইরান ঃ এ দেশে ২০০০ সালে ৫৫ হেক্টর জমিতে প্রায় ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। এদেশে দ্রুত গম উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাসপিয়ান সাগরের তীরবর্তী উত্তর ইরানে গোর্গান নদী উপত্যকা এবং দক্ষিণ পশ্চিমের সমতল অঞ্চলে গম চাষ হয়। এদেশের নিজস্ব চাহিদা মিটাতে বিদেশ থেকে গম আমদানী করতে হয়।

৭। অন্যান্য দেশ ঃ এ মহাদেশের সিরিয়া, ইরাক, সৌদী আরব, বাংলাদেশ, আফগানস্থান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় গম চাষ হয়।

খ) ইউরোপ মহাদেশ

এ মহাদেশে ২০০০ সালে ৫.৭৪ কোটি হেক্টর জমিতে প্রায় ১৮.৬৬ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। এ মাহদেশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে বিধায় গড়ে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ৩.২৫ মেট্রিক টন। পৃথিবীর প্রথম দশটি গম উৎপাদনকারী দেশের ৪টি এ মহাদেশে অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, রুশ ফেডারেশন, ইউক্রেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১। ফ্রান্স ঃ এ দেশটি ইউরোপ মহাদেশের শীর্ষ স্থানীয় ও বিশ্বের চতুর্থ প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এ দেশে মাত্র ৫২.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৩.৭৩ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। এ দেশটিতে বিশ্বের মোট গম ফলনের প্রায় ৬.৪% উৎপন্ন হয়। এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহারের কারণে গড় ফলন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। এ দেশের মধ্য প্যারিস উপত্যকা, উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর শীতকালীন গম চাষ হয়। ফ্রান্স খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন। অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি করে।

২। রুশ ফেডারেশন ঃ এ দেশটি বর্তমানে বিশ্বের ৫ম গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এদেশে ২.৩২ কোটি হেক্টর জমিতে ৩.৭০ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। যা বিশ্বের মোট গম উৎপাদনের ৫.৫৩ ভাগ প্রায় পতিত জমি উদ্ধার, উন্নতমানের বীজ, সেচ ব্যবস্থা, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি কারণে গম চাষে এ দেশটি উন্নতি লাভ করেছে। রাশিয়ার ভলগা নদীর অববাহিকা, ট্রান্স ইউলার ও পশ্চিম সাইবেরিয়া, আমু নদীর অববাহিকা, বৈকাল হ্রদ প্রভৃতি এলাকায় গম চাষ হয়ে থাকে। এদেশে শীত ও বসন্তকালীন গম চাষ হয়।

এদেশে উৎপাদিত গমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরন না হওয়ায় প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ গম আমদানী করে।

৩। জার্মানি ঃ বর্তমানে এদেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে এদেশে ২৯.৭১ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২.১২ কোটি মেট্রি কটন গম উৎপন্ন হয়। এদেশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয় বলে গমের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদেশের দক্ষিণের রাইল অববাহিকা এবং উত্তরের সমভূমি অঞ্চল বসন্তকালীন গম চাষ হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারে প্রচুর গম রপ্তানি করে।

৪। ইউক্রেন ঃ ২০০০ সালে ৫৬.৫০ হেক্টর জমিতে ১.২৭ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ৩ মেট্রিক টন। এদেশে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গম চাষ হয় এবং বেশীর ভাগ গম শীতকালে উৎপন্ন হয়। এদেশের পশ্চিমে দ্যানিস্তার নদী থেকে পূর্ব দ্যানিপার-দানেৎসব নদী অববাহিকা পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে গম চাষ হয়।

৫। যুক্তরাজ্য ঃ এ দেশে ২০০০ সালে ২১.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ করে মোট ১.৬৫ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। এদেশের পূর্ব ইংল্যান্ডে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয়। এছাড়া ওয়েলস, স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ার ল্যান্ডেও গম চাষ হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরন করে এদেশ বিদেশে গম রপ্তানি করে।

৬। অন্যান্য দেশ ঃ ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য গম উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে ইতালি, গ্রীস, হাঙ্গেরি, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে উল্লেযোগ্য পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় এবং অধিকাংশ দেশে গম রপ্তানি করে।

গ) উত্তর আমেরিকা

এ মহাদেশে ২০০০ সালে ৩.২৮ কোটি হেক্টর জমিতে গম হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৭৪ মেট্রিক টন। মোট উৎপাদন ৯.১৬ কোটি মেট্রিক টন। ইহা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৫.৭৩ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এ মহাদেশের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ।

১। যুক্তরাষ্ট্র ঃ এ দেশটি বর্তমানে পৃথিবীর তৃতীয় প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এ দেশে মোট ২.২০ কোটি হেক্টর জমিতে মোট ৬.১৯ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। ইহা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ১১%। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৮১ মেট্রিক টন।

এ দেশের অন্যতম প্রধান খাদ্য গম। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গম চাষ করা হয়। গমের ধরণ ও মৌসুম অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের গম আবাদী এলাকাকে চারটি অংশে ভাগ করা হয়।

ক) বসন্তকালীন লাল কঠিন গম বলয় ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমে বার্ষিক ৪০ থেকে ৬০ সে.মি. গড় বর্ষন যুক্ত প্রেইরী তৃণভূমি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ হয়। আবাদী রাজ্যগুলোর মধ্যে মান্টানা, উত্তর ও দক্ষিন ডাকোটা এবং মিনোসোটাতে বসন্তকালীন লাল কঠিন গম উৎপন্ন হয়।

খ) শীতকালীন লাল-কঠিন গম বলয় ঃ প্রেইরী তৃণভূমির দক্ষিণে শীতকালীন গমের চাষ করা হয়। এখানকার ৩০ থেকে ৫০ সে.মি. গড় বর্ষনযুক্ত অংশে লাল-কঠিন গম উৎপন্ন হয়। এ গম আবাদী রাজ্যগুলোর মধ্যে নেব্রাসকা, কানসাস, মিসৌরী, কলাহোমা এবং উত্তর টেকসাস উল্লেখযোগ্য।

গ) শীতকালীন লাল-নরম গম বলয় ঃ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৫০ থেকে ১০০ সে.মি. অপেক্ষাকৃত আর্দ্র অঞ্চলে লাল নরম গম উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনকারী রাজ্যগুলোর মধ্যে ইলিয়ন, ইন্ডয়ানা, ওহায়ও, পেনসিল বারনিয়া, মেরিল্যান্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঘ) সাদা নরম গম বলয় ঃ স্বল্প বর্ষন যুক্ত এদেশের পশ্চিম উপকূলবর্তী ক্যালিফোরনিয়া, ওরেগন এবং পূর্বাংশে বৃহৎ হ্রদ সন্নিহিত মিশিগান রাজ্যে শুষ্ক কৃষির আওতায় সাদা নরম গম আবাদ করা হয়। এ গম বসন্ত ও শীত উভয় ঋতুতেই উৎপাদন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ হয়। উৎপাদিত গমের অনেক অংশ উদ্বৃত্ত থাকে যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর প্রচুর পরিমান গম জাপান, চীন, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে।

২। কানাডা ঃ এদেশটি বর্তমানে পৃথিবীর ষষ্ঠ গম উৎপাদনকারী দেশ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যে ২য় স্থানের অধিকারী। ২০০০ সালে এ দেশে ১ কোটি হেক্টর জমিতে মোট ২.৬২ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়।

এ দেশের আলবার্টা, সাসকাচিউয়ান এবং ম্যানিটবা রাজ্যে বসন্তকালে গম চাষ হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গম চাষ হয় এবং উৎপাদিত গমের বেশীর ভাগই লাল কঠিন শ্রেণীর।

কানাডা প্রতি বছর প্রচুর পরিমান গম ইউরোপ ও দক্ষিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়।

৩। অন্যান্য দেশ ঃ এ মহাদেশের মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস প্রভৃতি দেশে সীমিত পরিমান গম চাষ হয়।

৪। পৃথিবীর রুটির ঝুঁড়ি ঃ উত্তর আমেরিকার কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের প্রায় ১৫ ভাগ গম উৎপন্ন হয়। এ মহাদেশের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত মৃদুভাবাপন্ন প্রেইরী তৃন ভূমি অঞ্চলে বেশীর ভাগ গম উৎপন্ন হয়। এখানে উৎপন্ন বসন্তও শীতকালীন লাল-কঠিন গম খুব ভাল মানের রুটি তৈরীর জন্য বিশেষ উপযোগী। পৃথিবীর বাজারে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রায় ৫০% থেকে ৬০% সরবরাহ করে থাকে। এ রপ্তানিকৃত গমের সবটুকুই প্রেইরী তৃনভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার যে অংশ থেকে এত বিপুল পরিমান ভাল মানের রুটি তৈরীর উপযোগী গমের সরবরাহ আসে সে অংশকে পৃথিবীর রুটির ঝুঁড়ি বলা হয়ে থাকে।

ঘ) দক্ষিন আমেরিকা ঃ এ মাহদেশে ২০০০ সালে ৮১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১.৯৩ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। যা পৃথিবীর মোট গম ফলনের মাত্র ২.৬৮ ভাগ। আর্জেন্টিনা এ মহাদেশের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ।

১। আর্জেন্টিনা ঃ এ দেশে ২০০০ সালে ৬১ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ করে মোট ১.৫০ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। যা দক্ষিণ আমেরিকার গম উৎপাদনের ৬৮ ভাগ। এ দেশের জলবায়ু মৃদু ভাবাপন্ন, গড় বৃষ্টিপাত ৪০ থেকে ৮০ সে.মি.। বিস্তৃত পাম্পা তৃনভূমি গম চাষের উপযোগী। শীত কালেই সিংহ ভাগ গম উৎপন্ন হয়। এদেশে যান্ত্রিক উপায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাল কঠিন গম আবাদ করা হয়। দেশের চাহিদা পূরন করে ইউরোপে প্রচুর গম রপ্তানি করা হয়।

২। ব্রাজিল ঃ এটি একটি অন্যতম গম উৎপাদনকারী দেশ। বার্ষিক গড় গম উৎপাদন প্রায় ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এদেশের আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে গমের চাষ হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরন না হওয়ায় প্রতি বছর এ দেশ প্রচুর পরিমান গম আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাষ্ট্র হতে আমদানী করে।

৩। অন্যান্য দেশ ঃ এছাড়া চিলি, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশেও কিছু কিছু গম উৎপন্ন হয়।

ঙ) আফ্রিকা ঃ এ মহাদেশে ২০০০ সালে ৮৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ১.৩৯ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়।

১। মরক্কো ঃ ২০০০ সালে এদেশে ২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত এ দেশে শীতকালে গম চাষ হয়। উপকূলীয় সমভূমিতে অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। বেশীরভাগ গম নিজস্ব খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারপর সামান্য পরিমান গম রপ্তানির সুযোগ পায়।

২। অন্যান্য দেশ ঃ এছাড়া মিশর, দক্ষিন আফ্রিকা, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশে আফ্রিকার অবশিষ্ট পরিমান গম উৎপন্ন হয়।

চ) ওসেনিয়া ঃ এ মহাদেশে ২০০০ সালে ১২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২.২৪ কোটি মে:টন গম উৎপন্ন হয়। অস্ট্রেলিয়া এ মহাদেশের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশ।

১। অষ্ট্রেলিয়া ঃ এটি বিশ্বের একাদশতম গম উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এদেশ ১১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২.২২ কোটি মেঃটন গম উৎপন্ন হয়। যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৪%। এদেশে শীতকালে গম উৎপন্ন হয়। দেশের অধিকাংশ গম ভূমধ্যসাগরীয় ভাবাপন্ন জলবায়ুগত অবস্থার প্রভাবাধীন ভিক্টোরিয়া, নিউসাউথ ওয়েলস এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় চাষ করা হয়। এ অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ করা হয়। তাই স্থানীয় চাহিদা পূরনের পর প্রচুর গম রপ্তানি করে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ নিউজিল্যান্ডের উত্তর দ্বীপে সীমিত পরিমান গম উৎপন্ন হয়। নিউজিল্যান্ড অষ্ট্রেলিয়া থেকে গম আমদানী করে।

গমের বিশ্ব বাণিজ্য

আর্ন্তরজাতিক বাজারে গম খাদ্য শস্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। হাল্কা জন বসতি পূর্ণ এলাকায় গম উদ্বৃত্ত থাকে। যা ঘনবসতি পূর্ন এলাকায় রপ্তানি হয়। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ২০% গম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে। প্রধান প্রধান গম উৎপাদনকারী প্রায় অধিকাংশ দেশ কমবেশী গম আমদানী করে। তাই রপ্তানিকারক দেশ কম এবং আমদানী কারক দেশ বেশী।

রপ্তানি ঃ গম রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, কানাডা, দ্বিতীয়, ফ্রান্স তৃতীয় এবং অষ্ট্রেলিয়া চতুর্থ। পৃথিবীর মোট রপ্তানির প্রায় ২২.৫৮% যুক্তরাষ্ট্র, ১৪.৫৪%, কানাডা, ১২.৫৯% ফ্রান্স এবং ১২.৫৮% অষ্ট্রেলিয়া হতে রপ্তানি হয়। তাই এ চারটি দেশই গম রপ্তানি নিয়ন্ত্রন করে। অন্যান্য গম রপ্তানি কারক দেশগুলো হলো আর্জেন্টিনা, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, কাজাকিস্তান, হাঙ্গেরি, ইউক্রেন, বেলজিয়াম, রাশিয়া, তুরস্ক, ইতালি প্রভৃতি।

আমদানি ঃ বিশ্বের অধিকাংশ দেশই কম বেশী গম আমদানী করে থাকে। আমদানী কারক দেশ গুলোর মধ্যে মিশর প্রথম, ইতালি দ্বিতীয়, ব্রাজিল তৃতীয় এবং জাপান চতুর্থ।

এছাড়া অন্যান্য আমদানী কারক প্রধান প্রধান দেশগুলো হলো উত্তর কোরিয়া, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, চীন, পাকিস্তান, মেক্সিকো, ইরান প্রভৃতি।

চা পাতা

পানি জাতীয় খাদ্য শস্যের মাধ্যে চা প্রধান। চা মৌসুমী অঞ্চলের পার্বত্য ও উচ্চ ভূমির ফসল। চা এক প্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে তৈরী করা হয়।

প্রথমে চীন দেশে চা উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকে পানীয় বা ঔষধ হিসেবে চা ব্যবহার হয়। বর্তমান সময়ে এটি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পানীয় রূপে গন্য হয়ে তাকে। এটির বৈজ্ঞানিক নাম থিয় সাইনেনসিস।

চা গাছ ঃ দুই প্রকার চা গাছ দেখা যায়। যথাঃ আসাম জাতীয় ও চীন জাতীয়। আসাম জাতীয চা প্রধানত: ভারত ও শ্রীলংকায় দেখা যায়। এ ধরনের চা গাছ আকারে বেশ বড় হয় এবং বহু পাতা যুক্ত হয়। পাতাগুলো অপেক্ষাকৃত বড় হয়। এটি ৬ মিটার পর্যন্ত উচু হয়ে থাকে। তাই পাতা পড়ারও তোলার জন্য ১.২ মিটারের বেশী বড় হতে দে'য়া হয় না। যার ফলে এ ধরনের চা পাতা ঝোপে পরিনত হয় ও বাণিজ্যিক ভাবে চাষের জন্য বেশ উপযোগী হয়। আসাম জাতীয় চা পাতা রংয়ের জন্য বিখ্যাত।

পক্ষান্তরে চীন জাতীয় চা পাতা আকারে অনেক ছোট ও পাতার সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এ গাছ সাধারনত: ছাটার প্রয়োজন হয় না। চীন জাতীয় চা গাছের চা পাতা স্বাদ ও গন্ধের জন্য বিখ্যাত। এশিয়ার বেশীর ভাগ বাগানে এ দুই প্রজাতির সংকর জাতের চা চাষ করা হয়। তবে দুধরনের চা পাতার উন্নত সংমিশ্রনের উপরই চায়ের গুনাগুন নির্ভর করে।

১। চা চাষের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ

চা চাষের ভৌগোলিক উপাদানসমূহকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভিক্ত করা যায়। যথা: ১) প্রাকৃতিক উপাদান ২) অর্থনৈতিক উপাদান এবং ৩) সাংস্কৃতিক উপাদান। নিম্নে ভৌগোলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করা হলো:

১। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ ঃ এ উপাদানগুলোর মধ্যে জলবায়ু, মাটি ও ভূ-প্রকৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এগুলোর বর্ণণা দে'য়া হলোঃ

ক) জলবায়ু ঃ চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। যার জন্য উষ্ণ ও বেশী বৃষ্টিযুক্ত এলাকায় চা আবাদ ভাল হয়।

(র) উত্তাপ ঃ চা একটি ক্রান্তিয় মৌসুমী অঞ্চলের ফসল। চার জন্য ২৩°-২৮° সে. উত্তাপ প্রয়োজন। তবে ২৮° সে. উত্তাপে ফসল ভাল হয়।

(রর) বৃষ্টিপাত ঃ চা চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। চায়ের চাষের জন্য ১৭৫ থেকে ২৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। তাই নিরক্ষীয় এবং আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ুতে চা চাষ ভাল হয়।

খ) মৃত্তিকা ঃ পানি জমে না থাকে এমন উর্বর লোহা মিশ্রিত দোয়াশ মাটি চা চাষের জন্য উপযোগী। তবে পরিমান মত নাইট্রোজেন, জিঙ্ক, ও পটাশিয়াম প্রয়োজন হয়।

গ) ভূ-প্রকৃতি ঃ উঁচু জমিতে পানি দ্রুত নিষ্কাশন ও সহজ বলে উচু জমিতে সাধারনত: চা চাষ ভাল হয়। চা গাছের গোড়ায় পানি জমলে চা গাছ মরে যায়। তাই পাহাড়ের ঢালে চা চাষ হয়।

২। অর্থনৈতিক উপাদান

ক) শ্রমিক ঃ চা চাষের জন্য জমি তৈরী, নিড়ান, চা গাছ ছাটাই ও চা সংগ্রহ কাজে দক্ষ প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। চা সংগ্রহে মহিলা ও অল্প বয়স্ক শ্রমিকদের চিকন ও সরু আঙ্গুল চায়ের পাতা সংগ্রহের অনুকূল। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চল চা চাষে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। লোকালয় হতে দূরে চা বাগান হবার কারণে চা বাগানের সাথে শ্রমিকদের আবাসস্থল গড়ে উঠেছে। পরিবারের সকল সদস্য বংশ পরম্পরায় এ কাজে নিয়োজিত।

খ) মূলধন ঃ চা বাগান তৈরী, সার-ক্রয়, শ্রমিকদের মজুরী; চা প্রক্রিয়াজাত করন প্রভৃতি কাজে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

গ) বাজার ঃ চায়ের চাষ চায়ের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু চা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ হয় তাই বিশ্ববাজারে চায়ের যথেষ্ট চাহিদা থাকায় চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ) পরিবহন ব্যবস্থা ঃ চা বাণিজ্যিক ফসল। তাই চা বাগান থেকে সংগ্রহের পর দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশের বাজারে পৌছানর জন্য পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হওয়া আবশ্যক, যাতে সহজে চা পরিবহন করা যায়।

৩। সাংস্কৃতিক উপাদান

ক) চারা ঃ উন্নতমানের চায়ের চারা চা চাষের জন্য একান্ত আবশ্যক। তা না হলে ভাল চা উৎপন্ন করা সম্ভব হবেনা।

খ) সার ঃ চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগ প্রয়োজন। নতুবা চায়ের ফলন আশানুরূপ হবে না। এছাড়া কীটনাশক, পানি, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতিও চায়ের উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়ক।

গ) সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে সরকারী উদ্যোগ অন্যতম। চাষের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য পেলে চায়ের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এমনকি রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়।

পৃথিবীর চা উৎপাদন ও বন্টন

পৃথিবীর মোট চায়ের প্রায় ৮৫ ভাগ এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে অবশিষ্ট চা উৎপাদন হয়। এশিয়া মহাদেশের বৃষ্টি বহুল মৌসুমী এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। আফ্রিকার চা বাগানগুলো পূর্বাঞ্চলীয় বৃষ্টিবহুল পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত।

মহাদেশ ভিত্তিক চা পাতা উৎপাদন

মহাদেশ	জমি (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন ((কেজি/হেঃ)	মোট ফলন (লক্ষ মেঃ টন)
এশিয়া	২১.৩৩	১১২০	২৩.৯০
আফ্রিকা	২.২১	১৭৫৪	৩.৮৮
দক্ষিণ আমেরিকা	০.৪৫	১৩৭৯	০.৬৩
বিশ্ব	২৪.০৬	১১৮৬	২৮.৫৩

মহাদেশ অনুযায়ী চা ফলনের বর্ণনা

মহাদেশের প্রসিদ্ধ চা বাগান অঞ্চল, বার্ষিক উৎপাদন প্রভৃতি নিম্নে বর্ণণা করা হলো:

ক) এশিয়া

এ মহাদেশে বিশ্বের সর্বাধিক চা উৎপাদিত হয়। ২০০০ সালে ২১.৩৩ হেক্টর জমিতে মোট ২৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয়। এ মহাদেশের ভারত, চীন, শ্রীলংকাতে অধিক পরিমান চা উৎপাদন হয়।

১। ভারত ঃ ভারত চা উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানে আছে। এ দেশে আট হাজার চা বাগান আছে। ২০০০ সালের এক হিসাবে দেখা যায় এদেশে ৪.৭০ লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট ৮৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়। একটি পৃথিবীর মোট চা উৎপাদনের ২৯.৬৩ ভাগ। বেশীর ভাগ চা বাগানগুলো আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের বৃষ্টি বহুল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের দারজিলিং এ অবস্থিত চা বাগান থেকে বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের চা উৎপাদিত হয়। সমুদ্র থেকে এ চা বাগানগুলো প্রায় ১২০০ মিটার বা তার চেয়ে বেশী উচুতে অবস্থিত। দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো দক্ষিণ ভারতের তামিল নাড়ূ ও কেরালা।

চা ভারতের অন্যতম বাণিজ্যিক ফসল। প্রতিবছর চা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। দেশের মোট উৎপাদিত চায়ের ২৯% বিদেশে রপ্তানি করে।

চিত্র ৩ ঃ পৃথীবীর চা উৎপাদনকারী অঞ্চল

২। চীন ঃ চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে চীন ৯.৫২ হেক্টর জমিতে চা চাষ করে মোট ৭.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে।

চীনের প্রধান চা অঞ্চলগুলো হলো হুনান, হুপে, আনউই, কিয়াংসি, চিকিয়া, ফুকিয়েন প্রভৃতি রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল। চীনের বাগানগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বছরে মাত্র তিনমাস চা সংগ্রহ করা হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদনও তুলনামূলকভাবে কম। চীন অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরন করে প্রতি বছর প্রচুর পরিমান চা বিদেশে রপ্তানি করে। এ দেশটি বর্তমানে চতুর্থ চা রপ্তানি কারক দেশ।

৩। শ্রীলংকা ঃ এদেশটি চা উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ২০০০ সালে ১.৯৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে চা চাষ করে মোট ২.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে। এদেশের পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পাহাড়ের ঢালে প্রায় সারা বছরই বৃষ্টি পাত হয়। ফলে সারা বছর ধরে সপ্তাহে দুবার চা পাতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। চা পাতার গুনগতমানও সেরা। চা রপ্তানিতে বর্তমানে শ্রীলংকা পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে।

নির্বাচিত দেশের চা পাতা উৎপাদন- ২০০০

দেশ	জমি (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হে:)	মোট ফলন (লক্ষ মে:টন)
ভারত	৪.৭	১৫৫৪	৮.৪৯
চীন	৯.৫২	৭৫৯	৭.২৩
শ্রীলংকা	১.৯৫	১৪৫২	২.৮৪
কেনিয়া	১.১৩	১৯৯১	২.২৫
ইন্দোনেশিয়া	১.১০	১৩৮৬	১.৫২
তুরস্ক	০.৮০	১৫০৪	১.২০
জাপান	০.৫১	১৭৯৫	০.৯১
বাংলাদেশ	০.৪৯	১০৪১	০.৫১
ইরান	০.৩৫	১৭৩৫	০.৬০
আর্জেন্টিনা	০.৩৮	১২৮৫	০.৪৯
মালাবি	০.২২	২২৭৩	০.৫০
জর্জিয়া	০.৩০	২০০০	০.৬০

উৎস ঃ ঋঅঙ বুলেটিন- ২০০০, ভলিউম- ১, সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা- ৩৮।

৪। ইন্দোনেশিয়া ঃ এটি বিশ্বের ৫ম চা পাতা উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এ দেশে ১.১০ হেক্টর জমিতে মোট ১.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন চা পাতা উৎপাদন হয়। এ দেশের পশ্চিম জাভার পার্বত্য ঢালে বহু চা বাগান গড়ে উঠেছে। এ দেশে পৃথিবীর প্রায় ৫.১৮% চা উৎপাদিত হয়। এটি একটি অন্যতম চা রপ্তানিকারক দেশে। এ দেশের বেশীর ভাগ চা নেদারল্যান্ডে রপ্তানি হয়।

৫। তুরস্ক ঃ চা উৎপাদনে তুরস্ক পৃথিবীর ষষ্ঠ। এ দেশের বেশীর ভাগ চা টমাস পর্বতের দক্ষিন ঢালে এবং আনাতোলিয়া মালভূমি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ২০০০ সালে এদেশে মোট ০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট ১.২ লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপাদিত হয়।

৬। জাপান ঃ এ দেশটি চা পাতা উৎপাদনে ৭ম। ২০০০ সালে এ দেশে ০.৫১ হেক্টর জমিতে মোট ০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়। জাপানের প্রধান চা উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো হনসু দ্বীপের শিজুউকা প্রদেশের জাপান-অল্পস পর্বতমালার পূর্ব ঢাল। চা জাপানের জাতীয় পানীয়। জাপান প্রতি বছর প্রচুর চা আমদানী করে।

৭। ইরান ঃ এ দেশের ক্যাসপিয়ান সাগর সংলগ্ন বৃষ্টিবহুল ঢালু অঞ্চলে অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত। এদেশে ২০০০ সালে ৩৫ হাজার হেক্টর জমিতে ৬০ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে।

৮। বাংলাদেশ ঃ এ দেশের উত্তর পূর্বাংশের পার্বত্য সিলেটে বেশীরভাগ চা বাগান অবস্থিত। ২০০০ সালে এদেশে ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে ৫১ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়। চা পাতা বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য।

৯। অন্যান্য দেশ ঃ এশিয়া মহাদেশের তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও চা চাষ হয়।

খ) আফ্রিকা

এ মহাদেশের কেনিয়া, শালাবি ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদন হয়। ২০০০ সালে এ মহাদেশে ২.২১ হেক্টর জমিতে ৩.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়।

১। কেনিয়া ঃ এ দেশটি বিশ্বের চতুর্থ এবং আফ্রিকা মহাদেশের প্রধান। এদেশ বিশ্বের মোট চা উৎপাদনের ৭.৪৯ ভাগ চা উৎপাদন করে। এদেশের চা উৎকৃষ্ট মানের। বেশীরভাগ চা বাগান রাজধানী শহর নাইরোবির নিকটবর্তী পার্বত্য ঢালু অঞ্চলে অবস্থিত। ২০০০ সালে ১.১৩ হেক্টর জমিতে ২.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়। বর্তমানে কেনিয়া চা রপ্তানি কারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

২। মালবি ঃ মালবি (নিয়াসা) হ্রদের পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য ঢালু অঞ্চলে এ দেশের চা বাগান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। চা পাতা এদেশের অন্যতম বাণিজ্যিক ফসল। ২০০০ সালে ২২ হাজার হেক্টর জমিতে ৫০ হাজার মেট্রিক টন চা পাতা উৎপাদন হয়। উৎপাদিত চা পাতার প্রায় সম্পূর্ণই বিদেশে রপ্তানি হয়।

৩। অন্যান্য দেশ ঃ আফ্রিকার উগান্ডা, মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ে প্রভৃতি দেশেও চা বাগান গড়ে উঠেছে।

গ) ইউরোপ

১। জর্জিয়া ঃ কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী জার্জিয়ার ককেসাস পার্বত্য অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে চা বাগান গড়ে উঠেছে। ২০০০ সালে এদেশ ৬০ হাজার মেট্রিক টন চা পাতা উৎপাদন করে। এদেশ রুশ ফেডারেশন ও অন্যান্য দেশে চা রপ্তানি করে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ যুক্তরাজ্য, হল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে চা পাতা আমদানি করে বিভিন্ন ব্রান্ডের মিশ্রন তৈরীর মাধ্যমে অন্যান্য দেশে তা পূন:রপ্তানি করে।

ঘ) দক্ষিণ আমেরিকা ঃ ২০০০ সালে ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে চা চাষ করে মোট ৬৩ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদন করে। এ মহাদেশের আর্জেন্টিনাতে সবচেয়ে বেশী চায়ের চাষ হয়।

১। আর্জেন্টিনা ঃ এ দেশের উত্তর পূর্বাংশের পারানা মালভূমিতে চা চাষ হয়। ২০০০ সালে ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে ৪৯ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদিত হয়। নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে এ দেশটি প্রচুর পরিমান চা রপ্তানি করে থাকে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও চা উৎপাদন হয়।

ঙ) অন্যান্য মহাদেশ

উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ওসেনিয়া অঞ্চলের পাপুয়া নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া ও কিজি দ্বীপ পুঞ্জে সীমিত পরিমান চা উৎপাদন হয়।

চায়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের গুরুত্ব রয়েছে। কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড চায়ের রপ্তানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পৃথিবীর সবদেশেই চায়ের কমবেশী চাহিদা রয়েছে। তবে উন্নত দেশগুলিই চায়ের প্রধান ক্রেতা।

চা রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা প্রথম, কেনিয়া দ্বিতীয়, ভারত তৃতীয় এবং চীন চতুর্থ। অন্যান্য চা রপ্তানি কারক দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনিয়া, মালাউই, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, উগান্ডা, তানজানিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

পক্ষান্তরে চা আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য প্রথম, রাশিয়া দ্বিতীয়, পাকিস্তান তৃতীয় এবং যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ। অন্যান্য চা আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে মিশর, চাপান, ইরান, জার্মানি, পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, আফগানিস্থান, ইরাক প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য বিশ্ববাজার থেকে চা আমদানী করে এবং পূন:রপ্তানি করে।

তামাক চাষ

তামাক এক প্রকার গাছের পাতা, যার আদি বাস আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে। বর্তমানে ইউরোপসহ অন্যান্য মহাদেশেও তামাক চাষ হয়।

তামাক হতে ধূমপানের জন্য সিগারেট, বিড়ি, চুরুট ইত্যাদি তৈরী হয়। এ ছাড়াও তামাক হতে নস্য, জর্দা, সুরভি প্রভৃতি সামগ্রিও প্রস্তত হয়। ধূমপানে নানাবিধ দূরারোগ্য রোগ হওয়া সত্বেও মানুষ ধূমপানে ব্যাপকভাবে অভ্যস্ত হচ্ছে। তবে বর্তমানে তামাক বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে।

তামাক চাষের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ

তামাক চাষের ভৌগোলিক উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

১। জলবায়ু ঃ তামাক চাষ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় হয়ে থাকে। তবে তুষারমুক্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও তামাক চাষ হয়। তামাক চাষের জন্য ১৬°-২১° সে. তাপমাত্রা এবং ৫০ থেকে ১০০ সে. মিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। শীত প্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে শীতকালে তামাক চাষ হয়।

২। মৃত্তিকা ঃ চুন ও পটাশ মিশ্রিত উর্বর বালুমাটি তামাক চাষের জন্য উপযোগী। এ ধরনের জমিতে গভীরভাবে চাষ করা প্রয়োজন হয়।

৩। ভূ-প্রকৃতি ঃ সমতলভূমি তামাক চাষের উপযোগী। তবে পাহাড়ের ঢাল ও পাদদেশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্পন্ন সমতল ভূমিতেও তামাক চাষ ভাল হয়।

অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ

১। মূলধন ঃ বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, চাষ ও মজুরীর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের অভাব হলে তামাক চাষ ব্যাহত হয়।

২। শ্রমিক ঃ তামাক চাষের জন্য গাছ রোপন, পাতা সংগ্রহ, গোলাজাতকরন প্রভৃতি কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। আমেরিকাতে শতকরা ৮৫ ভাগ নিম্ন সস্তা শ্রমিক তামাক চাষে ব্যবহৃত হয়।

৩। বাজার ঃ তামাক একটি বাণিজ্যিক ফসল। তাই তামাকের চাহিদার উপর তামাক চাষ বহুলাংশে নির্ভরশীল। চীনে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরনে এবং যুক্তরাষ্টে আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য তামাক চাষ করা হয়।

৪। পরিবহন ব্যবস্থা ঃ যেহেতু তামাক একটি অর্থকরী ফসল, তাই দেশে ও বিদেশের বাজারে তামাক বিক্রয়ের জন্য চাষ হয়ে থাকে। ফলে তামাক উৎপাদনের সাথে বিভিন্ন বাজারের সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা আবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তামাক সুলভে সমুদ্র পথে বিশ্ববাজারে সরবরাহের সুবিধার জন্য এদেশে তামাক উৎপাদনে উন্নতি লাভ করেছে।

গ) সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ

১। উন্নত মানের বীজ ঃ তামাক চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ ফলনশীন বীজ বপনে তামাক উৎপাদন ভাল হয়।

২। সার ঃ উন্নত তামাক ফলনের জন্য জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার সার ব্যবহার আবশ্যক।

৩। সরকারী উদ্যোগ ঃ সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা অধিক তামাক উৎপাদনে বেশ ফল দায়ক হয়।

মহাদেশ অনুযায়ী তামাক পাতা উৎপাদন- ১৯৯৯

মহাদেশ	জমি (হেক্টর হাজার হিসাবে)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি হিসাবে)	উৎপাদন লক্ষ (মে:টন)	উৎপাদনের হার (%)
এশিয়া	২৯০২	১৪৩৮	৪১.৭২	৬০.৮৬
উত্তর আমেরিকা	৪১৭	১৯৬৬	৮.২০	১১.৯৬
দক্ষিণ আমেরিকা	৪৬২	১৭৪৭	৮.০৮	১১.৭৮
ইউরোপ	৩০৪	১৮১৬	৫.৫৩	৮.০৭
আফ্রিকা	৩৯৭	১২৪৩	৪.৯২	৭.১৮
ওসেনিয়া	৪	২৪৫১	০.০৯	০.১৩
পৃথিবীর মোট	৪৪৮৬	১৬২৮	৬৮.৫৪	১০০%

তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল

১৯৯৯ সালে বিশ্বে মোট ৪৪.৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৬৮.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন হয়। তামাক উৎপাদনে উত্তর এশিয়া বিশ্বের প্রথম, উত্তর আমেরিকা দ্বিতীয় এবং দক্ষিন আমেরিকা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। নিম্নে মহাদেশ অনুসারে তামাক উৎপাদনের বিবরন দেয়া হলো:

এশিয়া

তামাক উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশ বিশ্বের প্রথম স্থানের অধিকারী। ১৯৯৯ সালে ২৯০২ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করে ৪১.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন করে। পৃথিবীর মোট তামাকের ৬০.৮৬ ভাগ এ মহাদেশে উৎপন্ন হয়। প্রধান উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে চীন, ভারত, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, আর্মেনিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এশিয়া মহাদেশের প্রধান প্রধান তামাক উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদন বর্ণনা করা হলোঃ

চিত্র ৪ ঃ পৃথিবীর তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল

১। চীন ঃ চীন তামাক উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম স্থানের অধিকারী। ১৯৯৯ সালে ১৪ লক্ষ ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে মোট ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার মেঃটন তামাক উপন্ন করে। যা পৃথিবীর মোট তামাক উৎপাদনের ৩৪.৬৪ ভাগ।

চীনের প্রধান তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো ইয়াং সিকিয়াং, সিকিয়াং নদী অববাহিকা এবং রেড অববাহিকার চেংতুর পানিসেচিত অঞ্চল। চীন বিশ্ববাজারে প্রচুর তামাক রপ্তানি করে।

২। ভারত ঃ এ দেশটি তামাক উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ১৯৯৯ সালে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন করে। ইহা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৯.২৬ ভাগ। এ দেশের অন্ধ্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, বিহার, পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে তামাক উৎপাদন হয়। অন্ধ্ররাজ্যে ভারতের ৪০ ভাগ তামাক উৎপাদন হয়। ভারতের উৎপাদনের ১৬.৩১ ভাগ তামাক বিদেশে রপ্তানি করে।

পৃথিবীর তামাক উৎপাদন- ১৯৯৯

দেশের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি প্রতি)	উৎপাদনের পরিমান (লক্ষ মেঃটন)	উৎপাদনের হার (%)
১। চীন	১৪৪৯	২৩৭৪	২৩.৭৪	৩৪.৬৪
২। ভারত	৪৪৫	১৪২৭	৬.৩৫	৯.২৬
৩। ব্রাজিল	৩৫২	১৭৫৯	৬.১৯	৯.১৩
৪। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	২৬৮	২২২৩	৫.৯৫	৮.৬৮
৫। তুরস্ক	২৯৩	৮৯৩	২.৬২	৩.৮২

দেশের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কেজি প্রতি)	উৎপাদনের পরিমান (লক্ষ মেঃটন)	উৎপাদনের হার (%)
৬। জিম্বাবুয়ে	৯২	২১০২	১.৯৩	২.৮২
৭। ইন্দোনেশিয়া	২২২	৬২১	১.৩৮	২.০১
৮। ইতালি	৪৮	২৭০৮	১.৩১	১.৯২
৯। গ্রীস	৬৭	১৮৭৫	১.২৬	১.৮৪
১০। কানাডা	২৬	২৮০৮	০.৭৩	১.০৭
১১। জাপান	২৬	২৫৬০	০.৬৭	০.৯৮
১২। আজার বাইজান	৮	১৮৫৪	০.১৫	০.২২
১৩। অন্যান্য	১১৯৮	১৫২৮	১৬.২৬	২৩.৭৪
বিশ্বের মোট	৪৫৩২	১৫২৮	৬৮.৫৪	১০০%

উৎস ঃ FAO ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন- ১৯৯৯; ভলিউম- ৩, সংখ্যা- ৪, পৃঃ ৩৩১।

৩। তুরস্ক ঃ তুরস্ক তামাক উৎপাদনে পৃথিবীর পঞ্চম। ১৯৯৯ সাথে ২.৯৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৫.৯৫ লক্ষ মেঃটন তামাক উৎপাদন হয়। ইহা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৮.৬৮ ভাগ। এ দেশে বিশ্বের সেরা তামাক উৎপাদন হয়। এ দেশ বিশ্ব বাজারে প্রচুর তামাক রপ্তানি করে।

৪। ইন্দোনেশিয়া ঃ এ দেশটি তামাক উৎপাদনে সপ্তম। ১৯৯৯ সালে মোট ১.৩৮ লক্ষ মেঃটন তামাক উৎপাদন করে। যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২.০১ ভাগ। এ দেশের সুমাত্রা ও জাভা তামাক উৎপাদনে বিখ্যাত। দেশের উৎপাদিত চা অভ্যন্ত রীণ চাহিদা পূরণ করে বিশ্ব বাজারে প্রতি বছর প্রচুর পরিমান তামাক রপ্তানি করে।

৫। অন্যান্য দেশ ঃ এছাড়া এশিয়ার জাপান, আজারবাইজান, কিরগিজিয়া, আর্মেনিয়া, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তামাক চাষ হয়।

উত্তর আমেরিকা

এ মহাদেশ তামাক উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে আছে। প্রতি বচর প্রায় ৪ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে তামাকের চাষ হয় এবং প্রায় ৮ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন হয়। ইহা প্রথিবীর মোট উৎপাদনের ১১.৯৬ ভাগ। এ মহাদেশের প্রধান তামাক চাষকারী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও কিউবা উল্লেখযোগ্য।

১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঃ এটি পৃথিবীর তামাক উৎপাদনে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। ১৯৯৯ সালে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার হেক্টর জমিতে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন হয়। ইহা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৮.৬৮ ভাগ। প্রধান তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল হলো কেন্টাকি, ভার্জিনিয়া, টেনেসি, উত্তর ও দক্ষিন ক্যারোলিনা এবং জর্জিয়া রাজ্য। এ অঞ্চলগুলোতে দেশের ৯০ ভাগ তামাক উৎপাদন হয়। ভার্জিনিয়া রাজ্যের তামাক স্বাদে ও গন্ধে পৃথিবীর সেরা। এ দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তামাক চাষ ও বাজারজাতকরন করে। এটি বিশ্বের প্রধান শীর্ষ স্থানীয় তামাক রপ্তানি কারক দেশ।

২। কানাডা ঃ কানাডা বিশ্বের দশম ও উত্তর আমেরিকার দ্বিতীয় তামাক উৎপাদনকারী দেশ। ১৯৯৯ সালে ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে ৭৩ হাজার মেঃটন তামাক উৎপাদন হয়। এ দেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুবই বেশী। এ দেশের মধ্যাঞ্চলে বেশী তামাক উৎপন্ন হয়।

৩। কিউবা ঃ এ দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩১ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন হয়। এ দেশের তামাক সুগন্ধির জন্য বিশ্ব বিখ্যাত।

দক্ষিন আমেরিকা

তামাক উৎপাদনে এ মহাদেশটি বিশ্বের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৯৯৯ সালে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার হেক্টর জমিতে ৮ লক্ষ ৮ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদন হয়। ইহা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১১.৭৮ ভাগ। এ মহাদেশের ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রাজিলে ১৯৯৯ সালে ২৬৮ হাজার হেক্টর জমিতে মোট ৬.১৯ লক্ষ মেঃটন তামাক উৎপাদন হয়। এটি বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৯.১৩ ভাগ। ব্রাজিল তামাক উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় এবং রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয়।

ইউরোপ

তামাক উৎপাদনে ইউরোপ মহাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ স্থানে আছে। ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী এ মহাদেশে ৩ লক্ষ ৪ হাজার হেক্টর জমিতে মোট ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন হয়। ইহা সারা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৮.০৭ ভাগ। এ মহাদেশের ইতালি, গ্রীস, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোপাভিয়া, ফ্রান্স, রুমানিয়া, মোলদাভিয়া প্রভৃতি দেশে তামাক উৎপাদন হয়। তার মধ্যে ইতালি বিশ্বের অষ্টম তামাক উৎপাদনকারী দেশ। প্রতি বছর প্রায় ৮৮ হাজার হেক্টর জমিতে ১.৩১ লক্ষ মেঃটন তামাক উৎপাদনকারী যা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ১.৯২ ভাগ। এ দেশটি প্রচুর তামাক রপ্তানি করে।

গ্রীস পৃথিবীর নবম তামাক উৎপাদনকারী দেশ। এ দেশ প্রতিবছর প্রায় ২৬ হেক্টর জমিতে ১.২৬ লক্ষ মেঃটন তামাক উৎপাদন করে। ইহা পৃথিবীর মোট তামাকের ১.৮৪ ভাগ। এ দেশটিও প্রচুর তামাক রপ্তানি করে। এ মহাদেশের বুলগেরিয়াও প্রচুর তামাক রপ্তানি করে।

আফ্রিকা

এ মহাদেশ তামাক উৎপাদনে অনুন্নত। ১৯৯৯ সালে ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার হেক্টর জমিতে মোট ১ লক্ষ ৯২ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপাদিত হয়। ইহা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৭.১৮ ভাগ। জিম্বাবুয়ে এ মহাদেশের তামাক উৎপাদনে প্রথম এবং বিশ্বের ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। প্রতিবছর প্রায় ৯২ হাজার হেক্টর জমিতে ১.৯৩ লক্ষ মেঃটন তামাক উৎপাদনকারী, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ২.৮২ ভাগ। এটি বিশ্বের তৃতীয় তামাক রপ্তানিকারক দেশ।
এ মহাদেশের আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মরক্কো, মালাগাছি, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও তামাক উৎপাদন হয়।

ওসেনিয়া

এ মহাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে কম চা উৎপাদন হয়। ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী ৪ হাজার হেক্টর জমিতে মোট ৯ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়। ইহা বিশ্বের মোট উৎপাদনের মাত্র ০.১৩ ভাগ। এ মহাদেশের অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসের পূর্বউপকূলে তামাক উৎপন্ন হয়। এটিই এ মহাদেশের প্রধান তামাক উৎপাদনকারী দেশ। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডে সামান্য তামাক উৎপন্ন হয়।

তামাকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

তামাক একটি অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল। উৎপাদিত তামাকের বেশীর ভাগই বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়।
তামাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রথম, ব্রাজিল দ্বিতীয়, জিম্বাবুয়ে তৃতীয় এবং তুরস্ক চতুর্থ। অন্যান্য তামাক রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে চীন, গ্রীস, ভারত, ইতালি, মালাউই, বুলগেরিয়ায় প্রচুর তামাক রপ্তানি করে।

অপরদিকে আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া বিশ্বের প্রথম, যুক্তরাজ্য দ্বিতীয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় এবং জার্মানী চতুর্থ। এছাড়া ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, স্পেন, মিসর, বেলজিয়াম প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও উল্লেখযোগ্য পরিমান চা বিশ্ব বাজার থেকে আমাদানি করে।

ইক্ষু চাষ

এটি একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফসল। গাছের আকৃতি অনেকটা ভুট্টার মত। ইক্ষুগাছের উচ্চতা ২.৪ হতে ৪.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। এর কান্ড থেকে মিষ্টি রস বের করা হয় যা দিয়ে গুড় বা চিনি তৈরী করা হয়। এর ছোবড়া ও পাতা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুর ছোবড়া দ্বারা কাগজও তৈরী করা হয়। এর রস হতে সুরাসারও তৈরী করা হয়।

ইক্ষু চাষের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ

ইক্ষু চাষের জন্য প্রধানত: ৩ টি উপাদান কাজ করে। আর তা হলোঃ প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক।

ক) প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

১। জলবায়ু ঃ এটি ক্রান্তি ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এর জন্য ১২৫-১৭৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত এবং গড়ে ২৪° সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন। ইক্ষু লাগানোর সময় বৃষ্টি দরকার। কিন্তু সংগ্রহের পূর্বে বৃষ্টি হলে তাতে চিনির পরিমান কম হয়।

সমুদ্র বায়ু ইক্ষুর জন্য উপযোগী বিধায় সমুদ্র উপকূলে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়। যার ফলে পার্বত্য অঞ্চলের উচু ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হয় না।

২। মৃত্তিকা ঃ চুন ও পটাশ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত দোঁয়াশ মাটি ইক্ষু চাষের বেশ উপযোগী। ইক্ষু চাষের জন্য নাইট্রোজেন বেশী প্রয়োজন। তাই লাভাযুক্ত মাটি ইক্ষু উৎপাদনের ফলন বৃদ্ধি করে।

ভূ-প্রকৃতি ঃ ইক্ষু চাষের জন্য সমতল ভূমি সহায়ক। ইক্ষুর গোড়ায় পানি জমে থাকে না এরূপ সমভূমি বা আংশিক তরঙ্গায়িত ভূমি ইক্ষু চাষের উপযোগী।

৪। বায়ু ঃ সমুদ্রের লোনা বায়ু আখ চাষের উপযোগী। তাই সমুদ্র পাড়ে বা নদীর কুলে আখ চাষ ভাল হয়। তবে অতিরিক্ত বাতাস বা ঝড় আখ চাষের জন্য ক্ষতিকর।

খ) অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ

১। মূলধন ঃ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আখ চাষের জন্য পশু বা যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ক্রয় এবং শ্রমিকের মজুরী প্রদানের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

২। শ্রমিক ঃ আখের চারা রোপন, শস্য কর্তন, প্রক্রিয়াজাতকরন প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর সস্তা শ্রমিক প্রয়োজন। তাই ঘন বসতিপূর্ন ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচুর শ্রমিকের সুবিধা আখ চাষের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৩। বাজার ঃ ইক্ষু একটি অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল তাই ইক্ষু হতে তৈরী চিনির বিশ্বব্যাপি চাহিদা থাকায় ইক্ষু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ লাভ জনক। ফলে ইক্ষুর বাজারের উপরও ইক্ষু চাষ নির্ভরশীল।

৪। পরিবহন ঃ পরিবহন ব্যবস্থা ইক্ষু চাষের জন্য আবশ্যক। আখ চিনি কলে বহন করা। উৎপাদিত চিনি দেশে ও বিদেশে পরিবহনের জন্য এবং আখ ক্ষেতে সার, যন্ত্রপাতি, কিটনাশক প্রভৃতি বহন করার জন্য উন্নত ও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়।

গ) সাংস্কৃতিক

চারা ঃ বর্তমানে উন্নতমানের আখের চারা উৎপাদন হওয়ায় হেক্টর প্রতি ইক্ষু ও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সার, কিটনাশক, পানি, সেচ প্রভৃতি আখ চাষের জন্য আবশ্যক।

২। সরকারী সাহায্য ঃ সরকরী উদ্যেগ ও সহযোগিতা আখ চাষের অগ্রগতিতে আখের চাষের উন্নতি সাধন হয়। সরকারের আর্থিক, কারিগরিক ও মানুষিক সহযোগিতা আখ চাষের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

ইক্ষু আবাদী অঞ্চল ও ফলন

ইক্ষু উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশ প্রথম, দক্ষিণ আমেরিকা দ্বিতীয় এবং উত্তর আমেরিকা তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এ তিন মহাদেশে বিশ্বের ৯০ ভাগ ইক্ষু উৎপাদন হয়। ২০০০ সালে বিশ্বে মোট ১.৯৩ কোটি হেক্টর জমিতে মোট ১২৭.১১ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন হয়।

মহাদেশ ভিত্তিক ইক্ষুর ফসল- ২০০০

মহাদেশ	জমি (লক্ষ হেক্টরে)	গড় ফলন (মেঃটন/হেঃ)	মোট ফলন (কোটি মেঃটন)
এশিয়া	৮৭.১৫	৬৬.৪২	৭.৮৮
দক্ষিণ আমেরিকা	৫৬.৩৫	৭০.৫৪	৩৯.৭৫
উত্তর আমেরিকা	২৮.৫০	৫৮.৮৪	১৬.৭৭
আফ্রিকা	১৪.০৩	৬২.৬৯	৮.৭৯
ওসেনিয়া	৪.৮০	৮১.২৪	৩.৯০
বিশ্বে মোট	১৯০.৮৪	৬৬.৬১	১২৭.১১

উৎস ঃ FAO বুলেটিন- ২০০০, ভলিউম- ১, সংখ্যা ২, পৃঃ ১১৫-১১৬।

এশিয়া

১। ভারত ঃ বর্তমানে বিশ্বে ভারত ইক্ষু উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী। ২০০০ সালে ভারত ৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩১.৫১ কোটি মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করে। ইহা বিশ্বের মোট ফলনের ২৪ ভাগ। হেক্টর প্রতি প্রায় ৭৫ মেঃটন। ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার ইক্ষুর জন্য বিখ্যাত। তবে এ দেশের মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি প্রদেশে ভাল ইক্ষুর চাষ হয়। এ ছাড়া পশ্চিম বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবেও ইক্ষুর চাষ হয়।

২। চীন ঃ চীন এশিয়ার ২য় এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশে। এ দেশে ১০.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে বছরে প্রায় ৭.৯৮ কোটি মেঃটন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। চীনের প্রধান ইক্ষু চাষ হয় সিকিয়াং নদীর অববাহিকা এলাকায়।

চিত্র ৫ ঃ পৃথিবীর ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চলসমূহ

৩। থাইল্যান্ড ঃ এ দেশটি এশিয়ার আখ উৎপাদনে তৃতীয এবং বিশ্বে চতুর্থ। বিশ্বের প্রায় ৪% আখ এদেশে উৎপন্ন হয়। এ দেশের প্রায় ৯.২৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের আবাদ হয়। প্রতি বছর আখের উৎপাদন প্রায় ৫.১২ কোটি মেট্রিক টন। দেশের পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাংশে ইক্ষু চাষ হয় বেশী।

৪। পাকিস্তান ঃ এ দেশটিতে প্রায় ১০.১০ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৪৫ মেট্রিক টন। ২০০০ সালে এ দেশে মোট ৪.৬৩ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। প্রধান ইক্ষু চাষ অঞ্চল হলো মূলতান এবং লায়ালপুর।

৫। ইন্দোনেশিয়া ঃ এদেশের জাভা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী আখ চাষ হয়। এদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন প্রায় ৬৩ মেট্রিক টন। ২০০০ সালে এদেশে মোট ২.১৪ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদিত হয়। জমির পরিমান ৩.৪ লক্ষ হেক্টর।

৬। ফিলিপাইন ঃ এদেশে মোট ৩.৫৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৭৩.৪২ মেট্রিক টন প্রায়। ২০০০ সালে এদেশে ২.৬৩ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন হয়।

৭। অন্যান্য দেশ ঃ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে তাইওয়ান, জাপান, মায়ানমার, বাংলাদেশ, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও যথেষ্ট আখ চাষ হয়।

প্রধান প্রধান দেশসমূহে ইক্ষু উৎপাদন

দেশ	জমি (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন (মেঃটন/হেঃ)	মোট ফলন কোটি মেঃটন
ব্রাজিল	৪৪.৬৩	৬৯.৫৫	৩১.০৪
ভারত	৪২.০০	৭৫.০২	৩১.৫১
চীন	১০.৪৮	৭৬.১১	৭.৯৮
থাইল্যান্ড	৯.২৩	৫৫.৪৮	৫.১২
পাকিস্তান	১০.১০	৪৫.৪৮	৪.৬৩
মেক্সিকো	৬.৫৯	৭৪.৭২	৪.৯২
কিউবা	১১.০০	৩২.৭৩	৩.৬০
অষ্ট্রেলিয়া	৪.১৫	৮৭.৯৫	৩.৬৫
ইন্দোনেশিয়া	৩.৪০	৬২.৯৪	২.১৪
কলম্বিয়া	৪.০০	৯২.৫০	৩.৭০
ফিলিপাইন	৩.৬৮	৭৩.৪২	২.৬৩
যুক্তরাষ্ট্র	৪.১৫	৮০.০৮	৩.৩২

উৎস ঃ FAO বুলেটিন- ২০০০, ভলিউম- ১, সংখ্যা- ২, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬।

দক্ষিন আমেরিকা

এ মহাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় ইক্ষু উৎপাদক। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩১% এখানে উৎপাদন হয়। এ মহাদেশে ৫৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৯.৭৫ কোটি মেঃটন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৭৫ মেট্রিক টন। প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১। ব্রাজিল ঃ এটি পৃথিবীর ২য় ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের প্রায় ২৪% ইক্ষু এদেশে উৎপন্ন হয়। দেশের ৪৪ লক্ষ হেক্টর জমি ইক্ষু চাষের আওতায় রয়েছে। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন প্রায় ৬৯.৫৫ মেঃটন। ২০০০ সালে এদেশে ৩১.০৪ কোটি মেট্রিক টন আখ উৎপাদিত হয়েছে। প্রথমে এদেশের উত্তর-পূর্বের উপকূলের নিম্ন ভূমিতে ইক্ষু চাষ হয়। এটি দেশের প্রধান ইক্ষু চাষ অঞ্চল। তবে পূর্ব মধ্য মালভূমির তরঙ্গিত ভূমিভাগ হতে দেশের অর্ধেকেরও বেশী ইক্ষু উৎপাদন হয়। এ দেশ থেকে বিশ্বে চিনি রপ্তানি হয় এবং বিশ্বের তৃতীয় চিনি রপ্তানিকারী এদেশ।

২। কলম্বিয়া ঃ এটি এ মহাদেশের ২য় প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ এবং পৃথিবীর দশম স্থানের অধিকারী। এদেশে হেক্টর প্রতি ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপন্ন হয় এবং ২০০০ সালে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু চাষ করে মোট ৩.৭০ কোটি মেঃ টন ইক্ষু উৎপাদন হয়। এ দেশের প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো ম্যাগডেলেনা নদীর উপত্যকা এবং উত্তরাংশের ক্যারেবীয় সাগরের নিকটবর্তী সমভূমি অঞ্চল।

৩। আর্জেনন্টিনা ঃ এটি বিশ্বের অন্যতম ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ। এ দেশটির ২.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমি ইক্ষু চাষের আওতায় এসেছে। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৭০ মেঃটন। ২০০০ সালে এদেশে মোট ১.৯৪ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন হয়। এদেশের উত্তর পূর্বের আন্দিজ পর্বতমালার ঢালে ইক্ষু চাষ হয়। প্রধান ইক্ষু অঞ্চলগুলো দেশের সালতা এবং তুকুমান প্রদেশে অবস্থিত।

অন্যান্যদেশ ঃ এ মহাদেশের পেরু, ভেনেজুয়েলা, গায়না, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইক্ষুর চাষ হয়।

উত্তর আমেরিকা

এ মহাদেশে প্রায় ২৮.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। এ মহাদেশে বছরে প্রায় ১৬.৭৭ কোটি মেঃটন ইক্ষু উৎপাদন করে। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৫৯ মেঃটন। এ মহাদেশ বিশ্বের ১৩ ভাগ ইক্ষু উৎপাদন করে।

১। মেক্সিকো ঃ এ দেশের ইক্ষু চাষের আওতায় প্রায় ৬.৫৯ লক্ষ হেক্টর জমি রয়েছে। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৭৫ মেঃটন। ২০০০ সালে এদেশে ৪.৯২ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন করে। এ দেশের উপসাগরের তীরবর্তী উষ্ণ ও আর্দ্র ভাবাপন্ন ভেরাক্রুজ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী আখ উৎপন্ন হয়।

২। কিউবা ঃ এটি বিশ্বের ৭ম ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের চাষ করে ৩.৬০ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন হয়। ইহা বিশ্বের মোট ইক্ষু উৎপাদনের প্রায় ২.৭৯ ভাগ। এ দেশের ইক্ষুর উপর খুব বেশী নির্ভরশীল। মোট কৃষি জমির ৫০ ভাগে আখ চাষ হয়। এটি বিশ্বের চিনি রপ্তানিতে প্রথম স্থানের অধিকারী।

৩। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঃ এ দেশের ইক্ষুচাষের আওতায় প্রায় ৪.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু উৎপন্ন হয় এবং হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৮০ মেঃটন। ২০০০ সালে মোট ইক্ষু উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৩.৩২ কোটি মেট্রিক টন। এ দেশের উষ্ণ ও আর্দ্রভাবাপন্ন ফ্লোরিডা উপকূল এবং মিসিসিপি বদ্বীপ প্রধান ইক্ষু আবাদী অঞ্চল। এছাড়া হাওয়াই দ্বীপেও প্রচুর ইক্ষুর আবাদ হয়।

আফ্রিকা

এ মহাদেশে বিশ্বের মোট আখ উৎপাদনের মাত্র ৭% উৎপন্ন হয়। এ মহাদেশের প্রায় ১৪.০৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষুর চাষ করা হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ৬২ মেঃটন। ২০০০ সালে এ মহাদেশে ৮.৭৯ কোটি মেঃটন ইক্ষু উৎপাদন হয়। ইক্ষু আবাদী দেশের মধ্যে মিশর ও দক্ষিন আফ্রিকাই প্রধান।

১। মিশর ঃ এ দেশের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে দেশের বেশীর ভাগ ইক্ষু জন্মে। এদেশের ১.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১১৯ মেঃটন যা বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের। এ দেশটি ২০০০ সালে মোট ১.৪৫ কোটি মেঃটন ইক্ষু উৎপাদন করে।

২। দক্ষিন আফ্রিকা ঃ এ দেশের মোট ৩.২২ লক্ষ হেক্টর জমি ইক্ষু চাষের অওতায় আছে। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৭৪ মেঃটন। ২০০০ সালে এদেশে প্রায় ২.৪০ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন হয়। এদেশের নাটাল প্রদেশের সমুদ্র উপকূলভাগে অধিকাংশ ইক্ষুর আবাদ হয়।

৩। অন্যান্য দেশ ঃ মিশরে ২০০০ সালে প্রায় ৫৭ লক্ষ মেঃটন ইক্ষু উৎপাদন হয়। এছাড়া সুদান, কেনিয়া, মোজাম্বিক, মাদাগাসকার প্রভৃতি দেশে ইক্ষু আবাদ হয়।

ওসেনিয়া

এ মহাদেশের প্রায় ৩.৯০ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন করে। এ মহাদেশের প্রায় ৪.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৮১ মেঃটন। অষ্ট্রেলিয়া এ মহাদেশের প্রধান ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ যা এ মহাদেশের ৯০ ভাগ ইক্ষু উৎপাদন করে।

১। অষ্ট্রেলিয়া ঃ এ দেশের অধিকাংশ ইক্ষু প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী কুইন্সল্যান্ডের উপকূল ভাগে জন্মে থাকে। এ দেশের ইক্ষু চাষের আওতায় জমির পরিমান প্রায় ৪.১৫ লক্ষ হেক্টর এবং গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ৮৮ মেঃটন। ২০০০ সালে ৩.৬৫ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন করে। এটি বিশ্বের অষ্টম ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশ। এদেশটি বিশ্ববাজারে চিনি রপ্তানি করে থাকে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ এ মহাদেশের প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিজি, সামোয়া, তীহিতি প্রভৃতি দ্বীপে ইক্ষু চাষ হয়।

ইউরোপ

এ মহাদেশে ইক্ষু চাষ মাত্র ২ লক্ষ একর জমিতে হয়। মোট উৎপাদন প্রায় ১.৪৪ কোটি মেট্রিক টন। ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ইক্ষু চাষ হয়।

ইক্ষুর বিশ্ব বাণিজ্য

ইক্ষু ভারী ও পচনশীল বলে এর আমদানি ও রপ্তানিতে কোন ভূমিকা নেই। তবে ইক্ষু থেকে উৎপাদতি চিনি বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়। চিনি রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে কিউবা, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, আষ্ট্রেলিয়া, চীন, জার্মানি, মরিসাস, ইউক্রেন, কলম্বিয়া, ভারত প্রভৃতি। পক্ষান্তরে চিনি আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, দক্ষিন কোরিয়া, চীন, কানাডা, ইরান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি প্রধান।

পাঠ-সংক্ষেপ

- ধান পৃথিবীর প্রধান খাদ্য শস্য। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কম বেশী ধান উৎপাদন হয়। ধান উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উপাদনই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।
- ২০০০ সালে বিশ্বে মোট ২৫ কোটি ৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৫৯.২৯ কোটি মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়। এশিয়া মহাদেশেই পৃথিবীর প্রায় ৯০.১১ ভাগ ধান উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে চীন প্রথম, ভারত দ্বিতীয় এবং ইন্দোনেশিয়া তৃতীয় স্থানের অধিকারী।
- মোট উৎপাদনের মাত্র ৪ থেকে ৫ ভাগ চাল বিশ্ব বাজারে রপ্তানি করে।
- গম পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য শস্য। গম চাষের জন্য প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের এশিয়ায় ৪২%, ইউরোপে ৩২%, উত্তর আমেরিকায় ১৫%, দক্ষিন আমেরিকায় ৩% এবং বাকী গম ওসেনিয়ায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মে।
- ২০০০ সালে ২১.৫১ কোটি হেক্টর জমিতে ৫৮.২২ কোটি মেট্রিক টন গম উৎপাদন হয়। গম উৎপাদনে চীন প্রথম, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়, ভারত তৃতীয়, ফ্রান্স চতুর্থ এবং রাশিয়া ৫ম স্থানে রয়েছে। বিশ্বের মোট গম উৎপাদনের মাত্র ২০ ভাগ বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ করে।
- রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, কানাডা দ্বিতীয়, ফ্রান্স তৃতীয় এবং অষ্ট্রেলিয়া চতুর্থ। আমদানীকারক দেশ গুলোর মধ্যে মিশর প্রথম, ইতালি দ্বিতীয়, ব্রাজিল তৃতীয় এবং জাপান চতুর্থ স্থানে রয়েছে।
- পানি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চা প্রধান। চা উৎপাদনের জন্য জলবায়ুর প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। পৃথিবীর মোট চায়ের ৮৫ ভাগ এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। বিশ্বে মোট ২৪.০৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে চা পাতা উৎপন্ন হয় এবং ২০০০ সালে বিশ্বে মোট ২৮.৫৩ লক্ষ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপাদন হয়।
- ভারত বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ। দ্বিতীয় স্থানে চীন, তৃতীয় স্থানে শ্রীলংকা এবং চতুর্থ স্থানে কোরিয়া।
- চা একটি বাণিজ্যিক অর্থকরী ফসল। চায়ের বিশ্ব বাণিজ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। চা রপ্তানিকারক শ্রীলংকা প্রথম, কেনিয়া দ্বিতীয়, ভারত তৃতীয় এবং চীন চতুর্থ।
- চা আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, রাশিয়া দ্বিতীয়, পাকিস্তান তৃতীয় এবং যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থানে আছে।
- তামাক ধূপানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের সবদেশেই কম বেশী ধূমপায়ী আছে। তামাক ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। বিশ্বে মোট ৪৪.৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ করে মোট ৬৮.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন হয়।
- পৃথিবীর মোট তামাকের প্রায় ৬০.৮৬ ভাগ এশিয়াতে উৎপন্ন হয়। সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপন্ন হয় চীনে যা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৩৪.৬৪ ভাগ। দ্বিতীয় ভারত, তৃতীয় ব্রাজিল এবং চতুর্থ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রধান প্রধান তামাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, ব্রাজিল দ্বিতীয এবং জিম্বাবুয়ে তৃতীয়। আমদানী কারক দেশের মধ্যে রাশিয়া প্রথম যুক্তরাজ্য দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় এবং জার্মানী চতুর্থ।
- ইক্ষু একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফসল। ইক্ষু থেকে প্রধানত: চিনি তৈরী হয়। ইক্ষু উৎপাদনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদনের প্রভাব রয়েছে।
- ইক্ষু উৎপাদনে এশিয়া প্রথম, দক্ষিণ আমেরিকা দ্বিতীয়, উত্তর আমেরিকা তৃতীয় এবং আফ্রিকা চতুর্থ স্থানের অধিকারী।
- ২০০০ সালে বিশ্বে মোট ১.৯৩ কোটি হেক্টরে ১২৭.১১ কোটি মেট্রিক টন ইক্ষু উৎপাদন হয়।
- ইক্ষু উৎপাদনে ভারত প্রথম, ব্রাজিল দ্বিতীয়, চীন তৃতীয়, থাইল্যান্ড চতুর্থ এবং মেক্সিকো পঞ্চম স্থানে রয়েছে।
- ইক্ষু সরাসরি আমদানী বা রপ্তানি হয় না। তবে ইক্ষু থেকে উৎপাদিত চিনি রপ্তানি হয়। বিশ্ববাজারে চিনির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। চিনি রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে কিউবা, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানি প্রভৃতি প্রধান।

- পক্ষান্তরে চিনি আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, কানাডা, ইরান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ কৃষি ফসল পৃথিবীর সর্বত্র কম বেশী চাষ হয়?
ক. ধান খ. গম
গ. তামাক ঘ. আখ

২। পৃথিবীর কোন্ মহাদেশে সবচেয়ে বেশী ধান উৎপন্ন হয়?
ক. এশিয়া খ. আফ্রিকা
গ. উত্তর আমেরিকা ঘ. ওসেনিয়া

৩। পৃথিবীর প্রথম স্থানের ধান উৎপাদনকারী দেশ কোনটি?
ক. ভারত খ. ইন্দোনেশিয়া
গ. চীন ঘ. ভিয়েতনাম

৪। এশিয়া মহাদেশ কত ভাগ গম উৎপাদন করে?
ক. ৩০ ভাগ খ. ৩৫ ভাগ
গ. ৪০ ভাগ ঘ. ৪২ ভাগ

৫। বিশ্বের কোন্ মহাদেশে সবচেয়ে কম গম উৎপন্ন হয়?
ক. ইউরোপ খ. আফ্রিকা
গ. দক্ষিন আমেরিকা ঘ. উত্তর আমেরিকা

৬। কোন্ দেশ পৃথিবীর গম উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী?
ক. চীন খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. ভারত ঘ. ফ্রান্স

৭। কোন্ দেশ সবচেয়ে বেশী গম রপ্তানি করে?
ক. কানাডা খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. অষ্ট্রেলিয়া

৮। পানি জাতীয় খাদ্য শস্য প্রধানত: কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৯। এশিয়া মহাদেশে বিশ্বের চা উৎপাদনের প্রায় কত ভাগ উৎপন্ন হয়?
ক. ৭০ ভাগ খ. ৭৫ ভাগ
গ. ৮০ ভাগ ঘ. ৮৫ ভাগ

১০। কোন্ দেশ চা উৎপাদনে পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে রয়েছে?
ক. চীন খ. ভারত
গ. শ্রীলংকা ঘ. কেনিয়া

১১। কোন্ দেশ পৃথিবীর চা রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে?
ক. শ্রীলংকা খ. কেনিয়া
গ. ভারত ঘ. চীন

১২। তামাক চাষে কোন্ মহাদেশ শীর্ষ স্থানে?

ক. উত্তর আমেরিকা খ. দক্ষিন আমেরিকা

গ. এশিয়া ঘ. আফ্রিকা

১৩। এশিয়া মহাদেশে বিশ্বের প্রায় ৮০ ভাগ ইক্ষু উৎপাদন হয়?

ক. ৫০ ভাগ খ. ৪৫ ভাগ

গ. ৫৫ ভাগ ঘ. ৪০ ভাগ

১৪। বর্তমানে ইক্ষু উৎপাদনে কোন্ দেশ শীর্ষে রয়েছে?

ক. ভারত খ. ব্রাজিল

গ. চীন ঘ. থাইল্যান্ড

পাঠ- ৪ শিল্প ফসল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- কার্পাস তুলার উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- পাটের উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন

বিষয়বস্তু

এমন অনেক ফসল রয়েছে যেগুলোর আঁশ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই চাষ করা হয়। উদ্ভিদজাত গাছের আঁশসমূহের মধ্যে কার্পাস ও পাট তন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কার্পাস তুলা ও পাটের উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করা হল।

তুলা

তুলার ব্যবহার ঃ খাদ্য ও পানীয়ের পরই মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন। যে সকল উৎস থেকে বস্ত্র তৈরী হয় তুলা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। অনেক প্রাচীন কাল থেকেই ভারত, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশে তুলার ব্যবহার হয়ে আসছে। সব মানুষই বস্ত্র ব্যবহার করে। পৃথিবীর মোট বস্ত্রের ৬০ ভাগ তুলা থেকে তৈরী। কার্পাস গাছের গুটি-ফল পাকার পর ফেটে গেলে এর মধ্য থেকে সাদা আঁশ বের হয়। এ সাদা আঁশগুলোই কার্পাস তুলা। বীজ থেকে সাদা আঁশ ছাড়িয়ে নিয়া হয়। এটাকে তুলা বলে। এ তুলা থেকে সুতা তৈরী করা হয় এবং এ সুতা দিয়ে কাপড় তৈরী করে মানুষ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে।

তুলার শ্রেণী বিভাগ

তুলার গুন নির্ভর করে এর আঁশের রং, দৈর্ঘ, মসৃনতা, ঔজ্জলতা, সুক্ষ্মতা, দৃঢ়তা প্রভৃতির উপর এ সব গুনাগুনের উপর ভিত্তি করে তুলাকে প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা-

১। **দীর্ঘ আঁশ যুক্ত কার্পাস তুলা ঃ** যে তুলার আশ ৪.৫ সে. মিটার থেকে ৬.৫ সে. মিটার লম্বা হয়ে থাকে তা এ শ্রেণী ভূক্ত। এরূপ কার্পাসকে আবার সাগর দ্বীপীয় এবং মিশরীয় এ দুই শ্রেণী বিভক্ত করা হয়।

২। **মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ঃ** এ শ্রেণীর তুলার আঁশের দৈর্ঘ ২.১ সে. মিটার থেকে ২.৯ সে. মিটার লম্বা। এটিকে উচ্চ শ্রেণীর তুলাও বলা হয়। এ তুলা সাদা, শক্ত ও মিহি। কিন্তু রেশমের আভাশূন্য।

৩। **ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ঃ** এ শ্রেণীর তুলার আঁশের দৈর্ঘ ২.২ সে. মিটারের নীচে। এ তুলার মান সবচেয়ে কম। এ দিয়ে মোটা কাপড় তৈরী হয়।

তুলা চাষের ভৌগোলিক উপাদানসমূহ

তুলা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক উপাদানগুলোকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাকৃতিক উপাদান, অর্থনৈতিক উপাদান এবং সাংস্কৃতিক উপাদান।

প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১। **জলবায়ু ঃ** এটি ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। সামুদ্রিক বায়ু তুলার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। জলবায়ুর মধ্যে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতই প্রধান।

(র) উত্তাপ ঃ তুলা চাষের জন্য ২১°-২৮° সে. উত্তাপের প্রয়োজন হয়। ফুল ফোটা পর্যন্ত ২১°-২৪° তাপমাত্রা প্রয়োজন। ফলপাকা থেকে ফসল উঠান পর্যন্ত ২৫° থেকে ২৮° সে. তাপমাত্রা থাকা আবশ্যক।

(রর) বৃষ্টিপাত ঃ তুলার জন্য ৫০ থেকে ১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এর বেশী বৃষ্টি হলে তুলার ক্ষতি হবে এবং এর কম হলে সেচ প্রয়োজন হবে।

২। **মৃত্তিকা ঃ** চুন মিশ্রিত উর্বর জমি তুলা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তবে কৃষ্ণ মৃত্তিকা তুলা চাষের জন্য বেশী উপযোগী। এতে উদ্ভিদের খাদ্য ও পানি ধারন ক্ষমতা থাকে। উর্বর দোয়াস মাটিতেও তুলা হয়। তুলা চাষের জন্য পানি নিষ্কাশনের সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে হয়।

৩। **ভূ-প্রকৃতি ঃ** সমতল অথবা তরঙ্গায়িত জমিতে তুলা চাষ ভাল হয়। সমতলভূমিতে যান্ত্রিক চাষাবাদের সুবিধা ও পানি নিস্কাষনের জন্য একটু ঢালু থাকা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উপাদান

মূলধন ঃ আধুনিক যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ, সার ও শ্রমিকের মজুরী বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আবার কীটনাশক, ঔষুধ ক্রয় ও প্রয়োগের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে অনেক দেশে হেলিকপ্টারের সাহায্যে কীটনাশক ঔষধ ছিটায়।

২। **শ্রমিক ঃ** তুলা চাষের জন্য ও তুলা ছড়ানর জন্য প্রচুর শ্রমিক দরকার। যন্ত্রের সাহায্যে তুলা ছড়ান হলে তুলার মান নিয়ন্ত্রন করা যায় না। তাই তুলা ছড়ার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

৩। **বাজার ঃ** তুলা একটি অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল। তাই তুলা চাষ বাজারের চাহিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশ্বে তুলার যথেষ্ট চাহিদা থাকায় তুলার চাষ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। **পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** তুলার বাজার বিশ্বব্যাপী বলে উৎপাদিত তুলা বিশ্ব বাজারে পৌছার জন্য উৎপাদন স্থল থেকে বাজার পর্যন্ত পরিবহন ব্যবস্থা ভাল থাকা প্রয়োজন। এছাড়া শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, বীজ ইত্যাদি তুলা উৎপাদন স্থলে আনা নেয়ার জন্য পরিবহন আবশ্যক।

গ) সাংস্কৃতিক উপাদান

১। **বীজ ঃ** উন্নতমানের বীজ তুলা চাষের উন্নয়নের সহায়ক। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া সার, কীটনাশক, গবাদি পশু বা কৃষি যন্ত্রপাতিও তুলা চাষের উন্নয়নে সাহায্য করে।

২। **সরকারী সহযোগিতা ঃ** সরকারী সাহায্য সহযোগিতা তুলা উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তুলা উৎপাদন অঞ্চল এবং ফলন

পৃথিবীর তুলা উৎপাদনকারী দেশসমূহ হলো চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, উজবেকস্থান, তুরস্ক, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, তুর্কমেনিস্তান, মিশর, মালে প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

২০০০ সালে বিশ্বেমোট ১৮৯.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন তুলা উৎপাদন হয়।

মহদেশ অনুযায়ী তুলার উৎপাদন

মহাদেশ	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন হিসেবে)			উৎপাদনের হার (%)
	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০০
এশিয়া	১১২.৭৫	১১৫.৭৪	১০৯.৯১	৫৮.০৮
উত্তর আমেরিকা	৩২.৩৪	৩৯.৯৫	৪১.২৮	২১.৮১
আফ্রিকা	১৬.৮০	১৭.১৬	১৬.৫৯	৮.৭৭
দক্ষিণ আমেরিকা	৯.০৭	১০.২৫	৯.১৬	৪.৮৪
ইউরোপ	৫.০১	৫.১৩	৫.২৩	২.৭৫
ওসেনিয়া	৬.৬৬	৬.৯১	৭.০৮	৩.৭৫
বিশ্বে মোট	১৮২.৬৩	১৯৫.১৪	১৮৯.২৫	১০০%

এশিয়া মহাদেশে মোট তুলার ৫৮ ভাগ উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকা তুলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে এবং আফ্রিকা তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে।

মহাদেশ অনুযায়ী তুলা উৎপাদন নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

এশিয়া মহাদেশ

তুলা উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশ বিশ্বের প্রথম স্থানে আছে। ২০০০ সালে ১০৯.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন তুলা উৎপাদন করে। প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে চীন, ভারত, পাকিস্তান, উজবেকস্তান, তুরস্ক, তুরকমেনিান এবং তানজানিয়া উল্লেখযোগ্য স্থানে আছে।

১। **চীন ঃ** এ দেশটি বর্তমানে তুলা উৎপাদনে এশিয়ায় প্রথম স্থানে এবং বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এদেশ বিশ্বের প্রায় ২০ ভাগ তুলা উৎপাদন করে। দেশটির সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকে দ্রুত তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে চীন মোট ৩৮.৫০ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপাদন করে। এদেশের ৫০ লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষ করা হয়। চীনে প্রধানত উত্তর ও মধ্য চীনে তুলার চাষ হয়। চীনের হোয়াংহো নদীর আববাহিকার সানজি, হেনান, হিবেই প্রভৃতি এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তুলা উৎপাদন হয়। চীনের তুলা খুব উন্নতমানের নয়। বেশীর ভাগ মধ্যম ও নিম্ন মানের। চীন দেশের চাহিদা মিটাতে পারেনা। বরং পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ থেকে উন্নত মানের তুলা আমদানী করে।

২। **ভারত ঃ** বর্তমানে ভারত এশিয়ার দ্বিতীয় এবং বিশ্বে তৃতীয় তুলা উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের প্রায় ১১য় ভাগ তুলা এদেশে উৎপন্ন হয়। ২০০০ সালে এদেশে প্রায় ৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ২০.৫৭ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে সিংহভাগ তুলা উৎপন্ন হয়। তবে পাঞ্জাব, রাজস্থান ও তামিলনাড়ু প্রদেশেও তুলা উৎপন্ন হয়। দেশের বেশীর ভাগ তুলা উন্নত মধ্য মানের। এদেশে তুলার উপর নির্ভর করে গুজরাটের আহাম্মেদাবাদ এবং মহারাষ্ট্রের মুম্বাই (বোম্বে) এ বহু সংখ্যক কার্পাস বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ভারত প্রচুর পরিমান তুলা বিদেশে রপ্তানি করে।

৩। **পাকিস্তান ঃ** এদেশটি এশিয়ার তৃতীয় এবং বিশ্বের চতুর্থ প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট ৮ ভাগ তুলা এদেশে উৎপন্ন হয়। এদেশ ২০০০ সালে প্রায় ১৯.১২ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপাদন করে। এদেশের বেশীর ভাগ তুলা পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন বেশীরভাগ তুলাই উৎকৃষ্ট দীর্ঘ আঁশযুক্ত। দেশে তুলা নির্ভর বয়ন শিল্প স্থাপন হয়েছে এবং এদেশ কার্পাস বস্ত্র শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে। পাকিস্তান তার উৎপন্ন তুলার প্রায় অর্ধেক ভাগ চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে।

৪। **তুরস্ক ঃ** বর্তমানে তুলা উৎপাদনে তুরস্ক এশিয়ার পঞ্চম এবং বিশ্বের ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। ২০০০ সালে এদেশ মোট ৮.০২ মেঃটন তুলা উৎপাদন করে। এদেশের ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ঢালু অঞ্চলে তুলার চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। এদেশের বেশীর ভাগ তুলা দীর্ঘ আঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট মানের। দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরন করে বিশ্ববাজারে তুলা রপ্তানি করে।

৫। **উজবেকিস্তান ঃ** এদেশটি বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম তুলা উৎপাদনকারী দেশ। সাবেক সোভিয়েত আমলে মোট তুলার ৬৮ ভাগ এখানে উৎপাদিত হতো। এদেশের তুলা উৎপাদনের পরিমান ২০০০ সালে ছিল ১২ লক্ষ মেঃটন। এ দেশের আরল সাগরের তীরবর্তী এলাকা, আনু দরিয়ার তীর। এবং সমরখন্দ এলাকায় সবচেয়ে বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। এদেশের সাগরদ্বীপের তুলা খুব উন্নতমানের। অন্যান্য তুলা লম্বা ও মধ্যম মানের। এদেশ প্রচুর পরিমান তুলা বিদেশে রপ্তানি করে।

৬। **অন্যান্য দেশ ঃ** এ মহাদেশের তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তানে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। এছোড়া সিরিয়া, ইরান, বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশে কিছু কিছু তুলা উৎপন্ন হয়।

উত্তর আমেরিকা

এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান তুলা উৎপাদনকারী মহাদেশ। ২০০০ সালে ৪১.২৮ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপাদন করে, যা বিশ্বের মোট ফলনের প্রায় ২২ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্র প্রধান তুলা উৎপাদনকারী রাষ্ট্র।

১। **আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ঃ** এটি বিশ্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তুলা উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের প্রায় ২১ ভাগ তুলা এ দেশে উৎপন্ন হয়। ২০০০ সালে এদেশের তুলা উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩৯.৮৮ লক্ষ মেঃটন। এদেশের উৎপন্ন তুলার বেশীরভাগই লম্বা মধ্যম আঁশযুক্ত। এদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো বেশী তুলা উৎপাদন করে। এদেশের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী আঞ্চলটি টেকসাস হতে দক্ষিন কেরোলিনা পর্যন্ত ৪ হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ ও প্রস্থ ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। প্রধান তুলা উৎপাদনকারী রাজ্যের মধ্যে কেরোলিনা, জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি, টেনিস ও কেন্টাকি রাজ্য। এ রাজ্যগুলোতে প্রায় ৫০ ভাগ তুলা উৎপন্ন হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমান তুলা বিদেশে রপ্তানি করে। এটি বিশ্বের প্রধান রপ্তানিকরক দেশ। বিশ্বের ২৫ ভাগ তুলা রপ্তানি করে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, চীন, জাপান ও বাংলাদেশসহ বহুদেশে তুলা রপ্তানি করে।

২। মেক্সিকো ঃ এটি উত্তর আমেরিকার দ্বিতীয় তুলা উৎপাদনকারী দেশ। এটি প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হাজার মেঃটন তুলা উৎপাদন করে। মেক্সিকোর অনুকূল জলবায়ু, উর্বর মাটি, আধুনিক চাষাবাদ, নিশ্চিত বাজার প্রভৃতির জন্য তুলা উৎপাদনে উন্নতি লাভ করেছে।

২। অন্যান্য দেশ ঃ এছাড়া হন্ডুরাসে সীমিত পরিমান তুলা উৎপন্ন হয়।

দক্ষিন আমেরিকা

এ মহাদেশে ২০০০ সালে ৯.১৬ মেঃটন তুলা উৎপাদন করে। তুলা উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা উল্লেখযোগ্য।

ব্রাজিল ঃ এদেশটি দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান ও বিশ্বের সপ্তম তুলা উৎপাদনকারী দেশ। এদেশে ২১ লক্ষ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ হয়। ২০০০ সালে ৫.৫০ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত তুলার বেশীর ভাগই উন্নতমানের। এদেশের উত্তর পূর্বাংশে সমুদ্র উপকূলীয় রিওগ্রস্তি, সেরা প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত সাওপাওলো, পারানা, মিনাস গেরাইস প্রদেশের ঢালু অঞ্চলে তুলার চাষ সম্প্রসারিত করেছে।

২। **আর্জেন্টিনা ঃ** এদেশে ২০০০ সালে প্রায় ১.৪২ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত পাবানা নদী বিধৌত চাকো সমভূমি এলাকায় দেশের অধিকাংশ তুলা উৎপন্ন হয়।

৩। **অন্যান্য দেশ ঃ** এ মহাদেশের প্যারাগুয়ে, পেরু, বলিভিয়া, কম্বডিয়া প্রভৃতি দেশেও তুলা উৎপন্ন হয়।

আফ্রিকা

এটি তৃতীয় তুলা উৎপাদনকারী মহাদেশ। ২০০০ সালে এ মহাদেশে ১৬.৫৯ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। মিশর এ মহাদেশের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশ। এখানে পৃথিবীর মোট ৮.৮৭ ভাগ তুলা উৎপন্ন হয়।

১। **মিশর ঃ** ২০০০ সালে এ দেশটি ২.৪৫ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। মিশর তুলা চাষের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। এ দেশের নীল নদের বদ্বীপ এলাকায় তুলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এদেশে সামুদ্রিক জলবায়ু ও পানি সেচের ব্যবস্থা থাকায় উন্নতমানের তুলা উৎপন্ন হয়। এদেশের উন্নত দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা বিশ্ব বাজারে 'ইজিপ্সিয়ান কটন' নামে পরিচিত। দেশের কৃষি জমির প্রায় ৩৫ ভাগ জমিতে তুলা চাষ হয়। তাই দেশের অর্থনীতি তুলার উপর নির্ভর। দেশের উৎপাদিত তুলার প্রায় ৭৫ ভাগ রপ্তানি হয়। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের মাধ্যমে এ দেশের তুলা রপ্তানি হয়।

২। **মালি ঃ** এটি আফ্রিকার অন্যতম তুলা উৎপাদনকারী দেশ। এখানে প্রতিবছর প্রায় ২ লক্ষ ১৮ হাজার মেঃটন তুলা উৎপাদন হয়। এ দেশের তুলা দীর্ঘ আঁশযুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় বেশীর ভাগ তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়।

৩। **বেনিন ঃ** এটি আফ্রিকার তৃতীয় প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশ। বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়।

৪। **অন্যান্য দেশ ঃ** এ মহাদেশের তুলা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে বর্কিনাফাসো, আইভরিকোষ্ট, চাদ, জিম্বাবুয়েও তুলা উৎপন্ন হয়।

ইউরোপ

এটি ষষ্ঠ তুলা উৎপাদনকারী মহাদেশ। ২০০০ সালে প্রায় ৫.২৩ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপাদন করে। গ্রীস এ মহাদেশের প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশ।

গ্রীস ঃ ২০০০ সালে এদেশে ৪.২০ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। এদেশের এজিয়ান সাগর তীরবর্তী এলাকা তুলা চাষে বিশেষভাবে খ্যাত।

২। **অন্যান্য দেশ রুশ ফেডারেশন ঃ** এদেশে বিক্ষিপ্তভাবে সীমিত পরিমান তুলা উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে পশ্চিম অঞ্চলের উর্বর মাটিতে তুলার চাষ বেশী হয়।

এছাড়া এ মহাদেশের ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, স্পেন, পুর্তুগাল প্রভৃতি দেশে তুলা উপাদন হয়।

নির্বাচিত দেশের তুলা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

দেশ	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০
চীন	৪০.০০	৪০.০০	৩৮.৫০
যুক্তরাষ্ট্র	৩৯.১০	৩৮.১৮	৩৯.৮৮
ভারত	২৭.২৭	২৭.২০	২০.৫৭
পাকিস্তান	১৫.৬২	১৪.৯৫	১৯.১২
উজবেকস্তান	৯.৬৬	১২.০০	১২.০০
তুরস্ক	৮.০২	৮.০২	৮.০২
অষ্ট্রেলিয়া	৬.৬৬	৬.৯১	৭.০৮
গ্রীস	৩.৮০	৯.৯৫	৪.২০
মিশর	২.২৭	২.৯০	২.৪৫
আর্জেন্টিনা	৩.০০	৩.১৬	১.৪২
ব্রাজিল	৪.১৯	৪.৮৮	৫.৫০
তুর্কমেনিস্তান	২.০০	৩.৯০	২.৪০

ওসেনিয়া

এ মহাদেশে ২০০০ সালে ৭.০৮ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। এর প্রায় ৯৯% অষ্ট্রেলিয়াতে উৎপন্ন হয়।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২০০০ সালে এ দেশে ৭.০৮ লক্ষ মেঃটন তুলা উৎপন্ন হয়। এদেশের আর্দ্র ভাবাপন্ন উত্তর-পূর্ব কুইন্সল্যান্ডের ঢালু অঞ্চলে এদেশের সিংহ ভাগ তুলার চাষ হয়।

২। অন্যান্য দেশ ঃ ফিজি এবং সলমন দ্বীপপুঞ্জে সীমিত পরিমান তুলা উৎপন্ন হয়।

তুলার বিশ্ব বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুলার উৎপাদনের সংখ্যা কম। অধিকন্তু উৎপাদকদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরনে অনেক তুলা ব্যবহৃত হয়। আবার তুলার চাহিদা বিশ্ব ব্যাপি। বিশেষ করে শিল্প উন্নত দেশে তুলার উৎপাদন কম বা একেবারেই নেই। যার জন্য জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ও কানাডার মত শিল্প উন্নত দেশেও তুলা আমদানী করতে হয়।

বিশ্বের তুলা রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, উজবেকস্তান দ্বিতীয়, অষ্ট্রেলিয়া তৃতীয় এবং আর্জেন্টিনা চতুর্থ। অন্যান্য রপ্তানি কারক দেশগুলোর মধ্যে সিরিয়া, গ্রীস, মালাউড, মিসর, ক্যামেরুন পাকিস্তান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পক্ষান্তরে বর্তমানে তুলা আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে চীন প্রথম, ইন্দানেশিয়া দ্বিতীয, মেক্সিকো তৃতীয় এবং তুরস্ক চতুর্থ। অন্যান্য আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল, ইতালি, জাপান, দক্ষিন কোরিয়া, থাইল্যান্ড, পর্তুগাল, জার্মানি, দক্ষিন কোরিয়া প্রভৃতি বিশ্ববাজার থেকে প্রচুর তুলা আমদানি করে।

পাট

এটি তন্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে অন্যতম। পাট গাছ ২.৫ মিটার থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাট গাছের ছাল থেকে আঁশ সংগ্রহ করা হয়। পাটের মূল্য তুলনামূলক ভাবে কম।

পাটের ব্যবহার ঃ পাটের দ্বারা চট, থলে, কার্পেট, ত্রিপল, কাগজ ইত্যাদি তৈরী করা হয়। পাটের দ্বারা বিভিন্ন হস্ত শিল্প তৈরী করে। পাটের কচি পাতা শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সবুজ পাট দ্বারা মন্ড তৈরী করা হয়। পাটকাঠি জ্বালানি, ঘরের বেড়া, পার্টেক্স বোর্ড প্রভৃতিতে ব্যবহার করে।

পাট চাষের ভৌগোলিক উপাদনসমূহ

পাঠ চাষের ভৌগোলিক উপাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ ক) প্রাকৃতিক উপাদান খ) অথনৈতিক উপাদান গ) সাংস্কৃতিক উপাদান।

ক) প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

১। **জলবায়ু ঃ** পাট গ্রীষ্ম মৌসুমী এলাকার ফসল। পাটের জন্য উত্তাপ ও আর্দ্রতা প্রয়োজন। পাটের জন্য ২১° হতে ২৭° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন এবং ১৫০ থেকে ২০০ মিটার বৃষ্টি পাত প্রয়োজন। পাট বীজ বপনের সময় অল্প এবং গাছ বৃদ্ধির সময় অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়।

২। **মৃত্তিকা ঃ** পাটের জন্য উর্বর পলল বা ভারী দোঁআশ মাটি বেশ উপযোগী। পাট চাষে উর্বরতা শক্তি কমে যায়। তাই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে পৃথিবীর সেরা পাট উৎপন্ন হয়।

৩। **ভূ-প্রকৃতি ঃ** পাট চষের জন্য নিম্ন সমতল ভূমি প্রয়োজন। নিম্নভূমি বর্ষায় ডুবে যায় এবং পলল পড়ে উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নভূমিতে পাট পচাঁন সহজ হয়।

৪। **জলাশয় ঃ** পাট কেটে পানিতে কিছু দিন ডুবিয়ে রাখতে হয়। পানির নীচে পাট পচেঁ নরম হলে কান্ড থেকে আঁশ পৃথক করে রোদে শুকিয়ে নেয়। আবার পাট পচাঁর পর পানিতে আঁশ ছাড়ান সহজ হয়।

খ) অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ

১। **মূলধন ঃ** পাট চাষের জন্য জমি তৈরী, আগাছা পরিষ্কার, রোপন, পাট কাটা, পাট পচাঁন, পাটের কান্ড থেকে আঁশ পৃথক করা, শুকান, বীজ, যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরী প্রভৃতি কাজে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন।

২। **শ্রমিক ঃ** পাট চাষ থেকে শুরু করে আঁশ শুকান পর্যন্ত যাবতীয় কাজ হাতে করতে হয় বলে প্রচুর সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। জনবহুল ভারত ও বাংলাদেশে এ কারনে পাট চাষের বিস্তার লাভ করেছে।

৩। **বাজার ঃ** পাটের উৎপাদন পাটের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। এক সময় পাটের বিশ্ববাজারে ব্যাপক চাহিদা ছিল। তাই বাংলাদেশ ও ভারতে প্রচুর পাট উৎপন্ন হতো। কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের পর থেকে পাটের চাহিদা কমছে। ফলে বাংলাদেশেও আগের থেকে পাট উৎপাদন অনেক কমে গেছে।

৪। **পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** পাট একটি অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসল। ফলে উৎপাদন স্থল থেকে দেশে বিদেশে স্থানান্তর করার জন্য সুলভ ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। পাট রপ্তানি করার সুলভ ও উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা থাকায় বাংলাদেশ ও ভারতে পাট উৎপাদনে প্রসারতা লাভ করেছে।

গ) সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ ঃ সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে সেচ, সার, উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ও সরকারী উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ পাট উৎপাদন ও আবাদী অঞ্চল

এশিয়া মহাদেশে বিশ্বের প্রায় ৯৭ ভাগ পাট উৎপাদন হয়। ২০০০ সালে বিশ্বে মোট ১৯.৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৩.২৯ লক্ষ মেঃটন পাট উৎপাদন হয়।

মহাদেশ ভিত্তিক পাট উৎপাদন- ২০০০

মহাদেশ	জমি (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হেঃ)	মোট ফলন লক্ষ মেঃটন
এশিয়া	১৮.৭১	১৭২৯	৩২.৩৫
ইউরোপ	০.২১	২১৪৩	০.৪৫
দক্ষিণ আমেরিকা	০.১৪	৯৪২	০.১৩
আফ্রিকা	০.২২	৮৬৭	০.১৯
উত্তর আমেরিকা	০.১৬	১০৪৩	০.১৭
বিশ্ব	১৯.৪৪	১৭.১৩	৩৩.২৯

মহাদেশ অনুযায়ী পাটে উৎপাদনের বর্ণনা

মহাদেশ অনুসারে পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর প্রসিদ্ধ স্থান, বার্ষিক ফলন, বাণিজ্য প্রভৃতির বিবরণ নিচে দেয়া হলোঃ

এশিয়া

পাট উৎপাদনে এ মহাদেশ বিশ্বের প্রথম স্থানে রয়েছে। এ অঞ্চলের জলবায়ু ও মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এ মহাদেশ ২০০০ সালে ১৮.৭১ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে মোট ৩২.৩৫ লক্ষ মেঃটন পাট উৎপাদন করে। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ছিল ১৭২৯ কেজি। এ অঞ্চলের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশগুলো হলো ভারত, বাংলাদেশ, চীন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি। এ মহাদেশ বিশ্বের পাট উৎপাদনের প্রায় ৯৭ ভাগ উৎপাদন করে। নিচে এশিয়া মহাদেশগুলোর পাট উৎপাদন বর্ণনা করা হলোঃ

ভারত ঃ এ দেশটি বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় পাট উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এ দেশটি ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২০.৯০ লক্ষ মেঃটন পাট উৎপাদন করে। যা বিশ্বের মোট পাট উৎপাদনের প্রায় ৬৫ ভাগ। এ দেশের হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১৭৪২ কেজি।

এদেশের বৃষ্টিবহুল গঙ্গা অববাহিকায় ভারতে প্রায় অর্ধেক পাট উৎপন্ন হয়। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত আসাম রাজ্যে বেশ পাট উৎপাদন হয়। এদেশের অন্যান্য পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো হলো বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য।

মোট পাটের বেশীর ভাগ নিজ দেশের পাট ও চট কলগুলোতে ব্যবহৃত হয়। স্বল্প পরিমান পাট বিদেশে রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ ঃ বর্তমানে এ দেশটি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট পাটের প্রায় ২৫ ভাগ পাট এদেশে উৎপন্ন হয়। ২০০০ সালে বাংলাদেশে ৫.০১ লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট প্রায় ৮.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন পাট উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১৬২৩ কেজি। এদেশের বেশীর ভাগ পাট উচুমানের। পূর্বে এদেশে পৃথিবীর প্রায় ৭৫ ভাগ পাট উৎপন্ন হতো।

এদেশের বৃষ্টিবহুল ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্লাবিত সমভূমি অঞ্চলের উৎপন্ন পাট সেরা মানের। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং পদ্মা-গড়াই নদী বিধৌত এলাকাতেও পাট চাষ প্রাধান্য পেয়েছে।

এদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, যশোর, রংপুর প্রভৃতি জেলা পাট চাষের জন্য বিখ্যাত।

এদেশের চটকল এবং কার্পেট শিল্পে উন্নতমানের পাটের আঁশ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কাঁচাপাট কাগজ কলের মন্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রচুর পরিমান পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এ দেশটি পাট রপ্তানীতে প্রথম স্থানে।

৩। **চীন** ঃ পাট উৎপাদনে চীন বিশ্বের তৃতীয় স্থানে। ২০০০ সালে ৬৭ হাজার হেক্টর জমিতে ১.৮৬ লক্ষ মেঃটন পাট উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল ২৭৭৬ কেজি। এদেশের পাটের মান মধ্যম ধরনের।

এদেশের বৃষ্টিবহুল জি-জিয়াং (সিকিয়াং) নদী অববাহিকার গুয়াংদং এবং গুয়াংজি প্রদেশে সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। তবে ইয়াংসির নিম্ন অববাহিকায় অবস্তিত ঝোজিয়াং এবং জিয়াংসু প্রদেশেও পাট চাষ হয়।

চীন দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ করার জন্য বিদেশ থেকে পাট আমদানী করে।

৪। **থাইল্যান্ড** ঃ এদেশে ক্রমশ পাট ও পাট জাতীয় তন্তুর চাষ বিস্তার লাভ করেছে। ২০০০ সালে এদেশে ৩৭ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৫৬ হাজার মেট্রিক টন পাট উৎপাদন করে।

মেনাম নদী উপত্যকায় এদেশের বেশীর ভাগ পাট উৎপাদন হয়। নিজস্ব চাহিদা পূরন করার জন্য এদেশটি বিদেশ থেকে পাট আমদানী করে।

৫। **অন্যান্য দেশ** ঃ ভিয়েতনামের মেকং বদ্বীপ এলাকা, মায়ানমার এর ইরাবতী নদী আববাহিকা এবং ইন্দোনেশিয়ার কালিমান্তান দ্বীপে কিছু পাট উৎপাদন হয়। এছোড়া নেপাল, ফিলিপাইন, কোরিয়া, জাপান ও শ্রীলংকাতে পাট চাষ হয়। তবে উৎপাদন খুব কম।

দেশভিত্তিক পাটের ফলন- ২০০০

দেশের নাম	জমি (লক্ষ হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হেঃ)	মোট ফলন (লক্ষ হেক্টর)
ভারত	১২.০০	১৭৪২	২০.৯০
বাংলাদেশ	৫.০১	২৬২৩	৮.১৩
চীন	০.৬৭	২৭৭৬	১.৮৬
থাইল্যান্ড	০.৩৭	১৫১৫	০.৫৬
রুশ ফেডারেশন	০.২১	২১৪৩	০.৪৫
ভিয়েতনাম	০.০৪	২২২০	০.০৯
মায়ানমার	০.৩৭	৮৯৭	০.৩৩
ব্রাজিল	০.০২	৯৪৮	০.০২
নেপাল	০.১২	১২৬৭	০.১৬
অন্যান্য	০.৬৩	১৬৫৬	০.৭৯
বিশ্ব	১৯.৪৪	১৭১৩	৩৩.২৯

উৎস ঃ FAO বুলেটিন, ২০০০, ভল:১, সংখ্যা: ২, পৃঃ ১৪৪।

ইউরোপ

রুশ ফেডারেশন ঃ এদেশে ২০০০ সালে ৪৫ হাজার মেট্রিক টন পাট উৎপন্ন হয়। পাট চাষের আওতায় জমির পরিমান প্রায় ২১ হাজার হেক্টর। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২১৪৩ কেজি। এদেশের ক্যাসপিয়ান সাগরবর্তী নিম্ন ভল্গা আববাহিকায় অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হয়। এছাড়া মস্কো, লেনিনগ্রাড, ইউক্রেন, ও সাইবেরিয়ায় কিছু পাট জাতীয় ফসল ফলে।

দক্ষিন আমেরিকা

১। **ব্রাজিল ঃ** ২০০০ সালে ২ হাজার হেক্টর জমিতে ২ হাজার মেঃটন পাট উৎপন্ন হয়। এদেশের বৃষ্টিবহুল আমাজান বদ্বীপে পাটের চাষ হয়।

২। **অন্যান্য দেশ ঃ** এ মহাদেশের গায়ানা, ভেনিজুয়েলা, পেরু ও চিলিতে সামান্য পাট উৎপন্ন হয়।

অন্যান্য মহাদেশ

আফ্রিকার মিশর, তান্জানিয়া, মোজাম্বিক, কঙ্গো, সুদান এবং উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত পরিমান পাট উৎপন্ন হয়।

পাটের বিশ্ব বাণিজ্য

এক সময় পাটের বিশ্ববাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু পাটের বিকল্প হিসেবে কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবার ফলে ১৯৭০-১৯৮০ এর দশকে পাটের ব্যবহার হ্রাস পায়। ফলে পাটের বিশ্ব বাণিজ্যও হ্রাস পায়। তবে বর্তমানে পরিবেশ বন্ধন হিসেবে পরিচিত পাটের ব্যবহার আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাঁচাপাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখনও বিশ্ববাজারে এককভাবে প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছে। যদিও চীন এবং ভারত পাট রপ্তানি করে। কিন্তু এ দুটি দেশও বাংলাদেশ থেকে প্রচুর উন্নত মানের পাট আমদানী করে। তবে থাইল্যান্ড, ভিযেতনাম, চীন ও নেপাল সামান্য পরিমান পাট রপ্তানি করে।

পাট আমদানীকারক দেশ গুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, মিশর, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, রাশিয়া ও আমেরিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিশ্বের প্রধান পাট আমাদানী কারক দেশ পাকিস্তান, দ্বিতীয় ভারত, তৃতীয় মিশর ও চতুর্থ ইন্দোনেশিয়া।

রাবার

নিরক্ষীয় বৃষ্টিবহুর অঞ্চলে এক ধরনের বৃক্ষের তরল নির্যাস রাবার নামে পরিচিত। হেভিয়া ব্রাজিলিয়েনসিস নামের এক বৃক্ষ রাবার নামে পরিচিত। এ ছাড়াও আরও অনেক গাছের রস থেকে রাবার প্রস্তুত করা হয়। হেভিয়া বৃক্ষ ব্রাজিলের আদি উদ্ভিদ। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার উৎপাদনের জন্য বিশ্বের বহু দেশে রাবার গাছের বাগান গড়ে উঠেছে।

রাবারের ব্যবহার ঃ প্রথমত: রাবার পেনসিলের দাগ মুছার জন্য ব্যবহৃত হতো। ঘষে দাগ মুছা হতো বলে একে রাবার বলা হয়। বর্তমানে রাবারের বহুবিধ ব্যবহার হচ্ছে। যেমন, চিকিৎসার বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, খেলার জিনিসপত্র, পুতুল, বল, ঝরনা কলম, ব্যাগ, বালিশ, টায়ার, টিউব, জুতা প্রভৃতিতে রাবার ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী না হওয়ায় এ উপাদান বৈদ্যুতিক শিল্পে অনেক বেশী পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাবার বৃক্ষের শ্রেণী বিভাগ এবং নির্যাস আহরন পদ্ধতি

উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে রাবারকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা: ক) বন্য রাবার ও খ) আবাদী রাবার।

ক) বন্য রাবার ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবে যে রাবার গাছ হয় তাকেই বন্য রাবার বলা হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের আফ্রিকার কঙ্গো নদী ও দক্ষিন আমেরিকার আমাজান নদীর উপত্যকায় প্রচুর পরিমানে বন্য রাবার উৎপন্ন হয়।

খ) আবাদী রাবার ঃ দক্ষিন পূর্ব এশিয়া রাবার গাছের উপযোগী হওয়ায় এ অঞ্চলে রাবার বৃক্ষের আবাদ করা হয়। এ জাতীয় রাবার বৃক্ষকে আবাদী রাবার বলা হয়। আবাদী রাবার বেশী উৎপন্ন হয় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ে। এছাড়া ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে আবাদী রাবার আছে।

রাবার গাছ পূর্ণ প্রাপ্ত হলে তা থেকে নির্যাস সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে গাছের গায়ে ধারাল ছুরি দ্বারা খাজ কাটা হয় এবং খাজের শেষ ভাগে একটি কাঠি বা নট সংযুক্ত করে দেয়া হয় একে স্পাউট বলে। নলের নিচে একটি পাত্র বসান হয়। নল দিয়ে রাবারের নির্যাস পড়ে নিচে বসান পাত্রে জমা হয়। সংগৃহীত রস প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রে প্রেরন করা হয়। একটি গাছ থেকে ৩০-৩৫ বছর পর্যন্ত একাদিক্রমে রস সংগ্রহ করা যায়।

রাবার চাষের অনুকূল উপাদানসমূহ

রাবার চাষের অনুকূল উপাদানগুলোকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ ১। প্রাকৃতিক, ২। অর্থনৈতিক এবং ৩। সাংস্কৃতিক।

১। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

ক) জলবায়ু ঃ রাবার উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত একই ভাবে থাকলে উৎপাদন ভাল হয়।

(র) উত্তাপ ঃ গড় উত্তাপ ২৬.৬° সেঃ অথবা এর অধিক হলে ভাল হয়। তবে কোন মাসেই ২১.১° সে. এর কম হওয়া বাঞ্চনীয় নয়।

(রর) বৃষ্টিপাত ঃ রাবার চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টির প্রয়োজন। গড়ে ২০০-২৫০ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে বেশী হলে রাবার ফলন ভাল হয়। বৃষ্টিপাত বিকেলে হলে ভাল হয়। এতে সকালে রস সংগ্রহে অসুবিধা হয় না।

খ) মৃত্তিকা ঃ উর্বর দোয়াশ মাটি রাবার চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বনাঞ্চলের গাছের পাতা পচে এ জাতীয় মাটি সৃষ্টি হয় বলে সেখানকার মাটি রাবার চাষের জন্য বেশী উপযোগী হয়।

গ) ভূ-প্রকৃতি ঃ রাবার গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যায়। তাই ঢালু বা পাহাড়ের ঢালে রাবার চাষ ভাল হয়। এ ধরনের জমিতে পানি নিস্কাশনের সুবিধা হয়।

২। অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ

ক) মূলধন ঃ রাবার একটি দীর্ঘমেয়াদী আবাদী ফসল বলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। জমি ক্রয়, আগাছা পরিস্কার করা, রাস্তা ও গৃহ নির্মান প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

খ) শ্রমিক ঃ রাবার গাছের চারার যত্ন নেয়া, আঠা সংগ্রহ করা, পরিচর্যা করা, রাবার প্রক্রিয়াজাত করা প্রভৃতি কাজে প্রচুর শ্রমিক দরকার হয়। বিশেষ করে গাছ থেকে রস বের করার জন্য গাছ কাটয়ে বিশেষ নিপুনতা প্রয়োজন হয়। নতুবা গাছ মারা যাবে অথবা কম রস সংগ্রহ হবে। অদক্ষতার কারণে অনেক বন্য রাবার বাগান ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে। এসকল কাজের জন্য দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচুর সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক পওয়া যায় বলে এ সকল অঞ্চলে রাবার আবাদ প্রসার লাভ করেছে।

গ) বাজার ঃ রাবার একটি বাণিজ্যিক ফসল। বিশ্ববাজারে রাবারে চাহিদার উপর রাবার চাষ বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাজারে প্রচুর চাহিদা থাকায় দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বহুদেশে রাবার চাষ করা হচ্ছে।

ঘ) পরিবহন ঃ রাবার চাষ হয় বিশ্বের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে। কিন্তু রাবার ব্যবহৃত হয় বিশ্বব্যাপি। তাই রাবার উৎপাদন স্থল থেকে ব্যবহৃত স্থানে নেবার জন্য উন্নত সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পৃথিবীর ৯০ ভাগ রাবার উৎপাদন হয় এবং এগুলো উপকূল ভাগে অবস্থিত বলে পরিবহন ব্যয় কম। যার ফলে রাবার উৎপাদনে প্রসারতা লাভ করেছে।

৩। সাংস্কৃতিক উপাদান ঃ সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে উন্নত জাতের চারা রোপন ও সরকারী উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সরকারী সাহায্য ও সহযোগীতা রাবার চাষের জন্য একান্ত আবশ্যক।

রাবার উৎপাদন অঞ্চল

বিশ্বের অধিকাংশ রাবার রস নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাগান থেকে সংগ্রহ করা হয়। বিশ্বের মোট রাবার উৎপাদনের ৯০ ভাগেরও বেশী শুধুমাত্র এশিয়া মহাদেশে হয়। আফ্রিকাও দক্ষিণ আফ্রিকাতে সীমিত পরিমান রাবার চাষ হয়।

চিত্র ৬ ঃ পৃথিবীর রাবার উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

নির্বাচিত দেশসমূহের রাবার উৎপাদন (লক্ষ মেঃটন)- ২০০০

দেশ	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	শতকরা হার
থাইল্যান্ড	২১.৬২	২১.৯৮	২২.৩৬	৩৩.৬১
ইন্দোনেশিয়া	১৫.৬৪	১৫.৬৪	১৬.৮৭	২৫.৩৬
মালয়েশিয়া	১০.৮২	৯.৭১	৭.৬৯	১১.৫৬
ভারত	৫.৪২	৫.৪২	৫.৫০	৮.২৭
চীন	৪.৫০	৪.৩০	৫.০০	৭.৫১
ব্রাজিল	০.৫৪	০.৫৪	০.৫৫	০.৭৬
ফিলিপাইন	২.১১	২.১১	০.৬৪	০.৮০
নাইজেরিয়া	০.৯০	০.৯০	১.০৭	১.৬১
আভোরিকোস্ট	১.১৬	১.১৬	১.১৯	১.৭৯
ভিয়েতনাম	২.০০	২.২৬	২.১৫	৩.৩২
বিশ্ব	৬৮.০০	৬৭.৬৮	৬৬.৫২	১০০%

উৎস ঃ FAO বুলেটিন- ২০০০, ভলিউম- ১, সংখ্যা- ২, পৃ: ১৪৬-১৪৭।

এশিয়া

এ মহাদেশের থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া, ভারত, চীন প্রভৃতি দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিশ্বের প্রায় ৯০ ভাগ রাবার উৎপাদন করে।

১। **থাইল্যান্ড ঃ** এটি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাবার উৎপাদনকারী দেশ। এদেশে ২০০০ সালে প্রায় ২২.৩৬ লক্ষ মেঃটন রাবার উৎপন্ন হয়। ইহা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৩৩.৬১ ভাগ। এ দেশের দক্ষিন অঞ্চলের বৃষ্টিবহুল এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশীর ভাগ বাগান গড়ে উঠেছে। থাইল্যান্ড অভ্যন্তরিন চাহিদা পূরণ করে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রাবার রপ্তানি করে।

২। **ইন্দোনেশিয়া ঃ** এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান রাবার উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এদেশে প্রায় ১৬.৮৭ লক্ষ মেঃটন রাবার আহরন করে। এটি বিশ্বের ২৫ ভাগ রাবার। এ দেশের সুমাত্রা দ্বীপে রাবার বাগান গড়ে উঠেছে। এছাড়াও জাভা ও কালিমান্তান দ্বীপে রাবার চাষ হয়। এ দেশের চাহিদা পূরনের পর বিপুল পরিমান রাবার জাপান, দক্ষিন কোরিয়া এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশ সমূহে রপ্তানি করে।

৩। **মালয়েশিয়া ঃ** এটি পৃথিবীর তৃতীয় রাবার উৎপাদনকারী দেশ। ২০০০ সালে এদেশ ৭.৬৯ লক্ষ মেঃটন রাবার উৎপাদন করে। ইহা পৃথিবীর মোট রাবারের ১১.৫৬ ভাগ। এদেশের মালয় উপ-দ্বীপের পশ্চিম উপকূলবর্তী পেনান থেকে দক্ষিনে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাবার বাগান বিস্তৃত। এখানে বৃটিশ শাসন আমলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাবার চাষ শুরু হয়। এদেশের সারাওয়াক অংশেও রাবার বাগান প্রসার লাভ করেছে।

এদেশ থেকে বিপুল পরিমান রাবার জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

৪। **ভারত ঃ** এদেশের দক্ষিন অংশে রাবার চাষ হয়। কেরালা, কর্নাটক ও তামিলনাড়ু রাজ্যে রাবার চাষ হয়। ২০০০ সালে এ দেশে ৫.৫০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়, যা বিশ্বের মোট রাবারের প্রায় ৮.২৭ ভাগ। এটি বিশ্বের চতুর্থ স্থানীয় রাবার উৎপাদনকারী দেশ।

এদেশের স্থানীয় চাহিদা পূরন করে সীমিত পরিমান রাবার বিদেশে রপ্তানি করে।

৫। **চীন ঃ** বিশ্বের পঞ্চম রাবার উৎপাদনকারী দেশ চীন। ২০০০ সালে এ দেশে মোট ৫.০০ লক্ষ মেঃটন রাবার উৎপাদন হয়, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৭.৫১ ভাগ।

দক্ষিন চীনের হাইনান দ্বীপে রাবার বাগন গড়ে উঠেছে। এদেশের নিজস্ব চাহিদা পূরনের পর বিদেশে প্রচুর পরিমান রাবার রপ্তানি করে।

৬। **ফিলিপাইন ঃ** ২০০০ সালে এদেশে ৬৪ হাজার মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। এদেশের নিরক্ষীয় ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে লুজন ও মিন্দানাও দ্বীপে অধিকাংশ রাবার উৎপন্ন হয়।

৭। **শ্রীলংকা ঃ** এ দেশের উপকূল ভাগে রাবার বাগান গড়ে উঠেছে। ২০০০ সালে এ দেশে ০.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়।

৮। **ভিয়েতনাম ঃ** এ দেশের উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে রাবার বাগান প্রসার লাভ করেছে। ২০০০ সালে এদেশে ২.১৫ লক্ষ মেঃটন রাবার উৎপাদন করে। দেশের উৎপাদিত রাবারের অধিকাংশ রপ্তানি করা হয়।

৯। **অন্যান্য দেশ ঃ** এছাড়া এ মহাদেশের কম্বোডিয়া, লাওস মায়ানমার ও বাংলাদেশে সীমিত পরিমান রাবার চাষ হয়।

আফ্রিকা

১। **নাইজেরিয়া ঃ** ২০০০ সালে এদেশে ১.০৭ লক্ষ মেঃটন রাবার উৎপাদন করে, যা বিশ্বের রাবারের ১.৬১ ভাগ। এদেশের বৃষ্টি বহুল দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে সিংহ ভাগ রাবার উৎপন্ন হয়।

২। **আইভরিকোষ্ট ঃ** ২০০০ সালে এদেশে ১.১৯ লক্ষ মেঃটন রাবার উৎপন্ন হয়, যা বিশ্বের প্রায় ১.৭৯ ভাগ।

৩। **অন্যান্য দেশ ঃ** এছাড়া এ মহাদেশের ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, জায়ার প্রভৃতি দেশেও রাবার উৎপন্ন হয়।

দক্ষিন আমেরিকা

রাবার গাছ ব্রাজিলের আদি উদ্ভিদ হওয়া সত্ত্বেও ইহা তেমন রাবার চাষে উন্নত হয়নি। কারণ রাবার চাষের উপযোগী স্থানগুলো খুব দুর্গম। এদেশের আমাজান নদীর আববাহিকার বনাঞ্চলে অধিকাংশ রাবার আহরন করা হয়। ২০০০ সালে এদেশে মাত্র ৫৬ হাজার মেঃটন রাবার উৎপাদন হয়। এদেশে সামান্য বন্য রাবারও হয়।

২। **অন্যান্য দেশ ঃ** এ ছাড়া এ মহাদেশের বলিভিয়া, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, গায়না, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশেও রাবার চাষ হয়।

রাবারের আর্ন্তরজাতিক বাণিজ্য

রাবার বিশ্ব বাণিজ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাবার উৎপাদন কয়েকটি শিল্পে অনুন্নত দেশের দখলে এবং রাবার ব্যবহার করে ব্যাপক ভাবে শিল্প উন্নত দেশ গুলোতে। রাবার উৎপাদন হয় এশিয়ার কয়েকটি দেশে যাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ রপ্তানি নির্ভর। এ কারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাবার খুবই গুরুত্ব পূর্ণ।

রাবার উৎপাদনের প্রায় ৭৯.২৮ ভাগ রাবার বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ করে। রাপ্তানি কারক দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ড প্রথম, ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় এবং মালয়েশিয়া তৃতীয়। বিশ্বের মোট রপ্তানিকৃত রাবারের প্রায় ৮৬ ভাগ এ তিনটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এছাড়া ভিয়েতনাম, আইভরীকোষ্ট, ক্যাম্বোডিয়া, হংকং, শ্রীলংকা, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া থেকেও রাবার রপ্তানি হয়।

অপর দিকে আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, জাপান দ্বিতীয় এবং চীন তৃতীয়। তাছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশও প্রচুর পরিমান রাবার আমদানি করে।

পাঠ-সংক্ষেপ

- অনেক উদ্ভিদ আছে যেগুলো শুধুমাত্র আঁশ সংগ্রহের জন্য চাষ করা হয় তার মধ্যে তুলা ও পাট অন্যতম।
- তুলা বস্ত্র তৈরীর অন্যতম প্রধান উৎস। পৃথিবীর মোট বস্ত্রের প্রায় ৬০ ভাগ তুলা থেকে উৎপন্ন হয়।
- তুলার গুনাগুন এর আঁশের রং, দৈর্ঘ, মসৃনতা উজ্জলতা, সুক্ষ্মতা, দৃঢ়তা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। তুলার গুনাগুন অনুসারে তুলাকে দীর্ঘ আঁশ, মধ্যম আঁশ ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত এ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।
- তুলা উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উপাদানই প্রধান। এছাড়া অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ।
- এশিয়া মহাদেশে পৃথিবীর প্রায় ৫৮.০৮ ভাগ তুলা উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর প্রধান তুলা উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, চীন দ্বিতীয়, ভারত তৃতীয় এবং পাকিস্তান চতুর্থ।
- বিশ্বের প্রধান তুলা রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, উজবেকস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- প্রধান আমদানী কারক দেশগুলোর মধ্যে চীন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, তুরস্ক, ব্রাজিল, ইতালি, দক্ষিন কোরিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- তন্তুফসলের মধ্যে পাট অন্যতম। পাট দ্বারা চট, থলে, গালিচা, ত্রিপল, কার্পেট, পাট কাঠি দ্বারা জ্বালানী, পারটেক্স প্রভৃতি তৈরী হয়। পাট উৎপাদনে এশিয়াই প্রধান। প্রায় ৯৭ ভাগ পাট এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়।
- প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে ভারত প্রধান, বাংলাদেশ দ্বিতীয়, চীন তৃতীয়।
- বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত দ্রব্যে প্রাধান্য বজায় রেখেছে। প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, মিশর, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, রাশিয়া ও আমেরিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।
- রাবার একধরনের গাছের আঠা। এটির আদিবাস ব্রাজিলে। রাবার লিখা মুছতে, বিভিন্ন খেলনা তৈরীতে, টায়ার, টিউব ও বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত হয়।
- রাবার দুপ্রকার ঃ বন্য রাবার এবং আবাদী রাবার। বিশ্বের বেশীরভাগ রাবার রস নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাগান থেকে উৎপন্ন হয়। বিশ্বের রাবারের প্রায় ৯০ ভাগ এশিয়াতে উৎপাদন হয়।
- রাবার উৎপাদনে থাইল্যান্ড প্রথম, ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয়, মালয়েশিয়া তৃতীয়, ভারত চতুর্থ এবং চীন পঞ্চম স্থানে আছে।
- রাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। রাবারের ব্যবহার বেশী হয় শিল্প উন্নত দেশে। রাবার উৎপাদনের প্রায় ৭৯.২৮ ভাগ বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করে। রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ড প্রথম, ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয এবং মালয়েশিয়া তৃতীয়। বিশ্বের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৬ ভাগ রাবার এ তিনটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- প্রধান আমদানীকারক দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, জাপান দ্বিতীয় এবং চীন তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বিশ্বের বস্ত্রের কত ভাগ তুলা থেকে উৎপন্ন হয়?
ক. ৪০ ভাগ খ. ৫০ ভাগ
গ. ৬০ ভাগ ঘ. ২০ ভাগ

২। তুলার গুনাগুন অনুসারে কত একে ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৩ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৫ ভাগে ঘ. ২ ভাগে

৩। কোন্ মহাদেশে সবচেয়ে বেশী তুলা উৎপন্ন হয়?
ক. আফ্রিকা খ. ওসেনিয়া
গ. উত্তর আমেরিকা ঘ. এশিয়া

৪। কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী তুলা উৎপন্ন হয়?
ক. ভারত খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. চীন ঘ. পাকিস্তান

৫। কোন্ দেশ তুলা রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানে?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. উজবেকিস্তান
গ. অষ্ট্রেলিয়া ঘ. পাকিস্তান

৬। কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়?
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত
গ. চীন ঘ. জাপান

৭। এশিয়া মহাদেশে পৃথিবীর কত ভাগ পাট উৎপন্ন হয়?
ক. ৮০ খ. ৯০
গ. ৯৫ ঘ. ৯৭

৮। বাংলাদেশ বিশ্বের কত ভাগ পাট উৎপাদন করে?
ক. ১৫ ভাগ খ. ২০ ভাগ
গ. ২৫ ভাগ ঘ. ৩০ ভাগ

৯। বিশ্বের প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ কোনটি?
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত
গ. চীন ঘ. নেপাল

১০। রাবারের আদি উৎপত্তি কোন্ দেশে?
ক. থাইল্যান্ড খ. ব্রাজিল
গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. মালয়েশিয়া

১১। রাবার উৎপত্তির দিক থেকে কত শ্রেণীর?
ক. ৫ খ. ৪
গ. ৩ ঘ. ২

১২। এশিয়া মহাদেশে কত ভাগ রাবার উৎপন্ন হয়?
ক. ৯০ খ. ৮০
গ. ৭৫ গ. ৭০

১৩। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাবার উৎপাদনকারী দেশ কোন্‌টি?
ক. ভারত গ. মালয়েশিয়া
গ. থাইল্যান্ড ঘ. ইন্দোনেশিয়া

১৪। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া মোট কত ভাগ রাবার রপ্তানি করে?
ক. ৮০ ভাগ খ. ৮৬ ভাগ
গ. ৯০ ভাগ ঘ. ৯৫ ভাগ

১৫। প্রধান রাবার আমদানীকারক দেশ কোনটি?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কোরিয়া
গ. ফ্রান্স ঘ. জার্মানি

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১
১। ঘ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২
১। ঘ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। ক ৭। খ ৮। ক ৯। ক ১০। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩
১। ক ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। গ ৭। ক ৮। ৮৫ ভাগ ৯। খ ১০। ক ১১। গ
১২। খ ১৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪
১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ ৫। ক ৬। খ ৭। ঘ ৮। গ ৯। ক ১০। খ ১১। ঘ ১২। ক
১৩। গ ১৪। খ ১৫। ক

রচনা মূলক প্রশ্নমালা

১. কৃষির গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও অনুকূল অবস্থা বর্ণনা করুন।
২. বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
৩. ব্যাপক কৃষি ও নিবিড় কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করুন।
৪. ধান উৎপাদনের অনুকূল উৎপাদনসমূহ বর্ণনা করুন। ধানের ব্যবহার বর্ণনা করুন।
৫. বিশ্বের ধান উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন।
৬. গমের ব্যবহার, গরুত্ব ও গম চাষের অনুকূল উপাদান বর্ণনা করুন।
৭. গমের উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন।
৮. ইক্ষুর ব্যবহার ও উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা করুন।
৯. ইক্ষুর উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন।
১০. তামাকের ব্যবহার ও উৎপাদনের অনুকূল উপাদনগুলো বর্ণনা করুন।
১১. তামাকের উৎপাদন, বন্টন ও বাণিজ্য বর্ণনা করুন।
১২. তুলার ব্যবহার ও অনুকূল উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।
১৩. তুলার উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন।
১৪. পাটের ব্যবহার ও উৎপাদনের অনুকূল উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
১৫. পাটের উৎপাদন, বন্টন ও বাণিজ্য বর্ণনা করুন।
১৬. রাবারের ব্যবহার ও উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা করুন।
১৭. রবারের উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন।
১৮. পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি বলতে কি বুঝেন? আলোচনা করুন।